Anusandhan
dreaming success

অনুসন্ধান সোসাইটির উদ্যোগ

ভাবনার সাথে শেখা-শিখি

প্রাথমিক শিক্ষা-উন্নয়নে কর্মশালা

বিষয় : শিশু মনে-ভাবনার সাথে শেখা

১৩ জুলাই ২০২৫

স্থান : বিধাননগর কলেজ, সল্টলেক, কলকাতা

যাঁদের লেখায় সুশোভিত

- শুভেচ্ছা বার্তা– শ্রী অশোকেন্দু সেনগুপ্ত
- সম্পাদকীয় : ভাষা শিখনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভূমিকা– শ্রী দিব্য গোপাল ঘটক
- সাক্ষাৎকার : শিশু-মনের চাহিদা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা– ড.দীপক রঞ্জন মন্ডল
- দৃষ্টিকোণ : শিশুর মন-ভাবনা-শেখা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য– ড. অমরেন্দ্র মহাপাত্র
- সাক্ষাৎকার : শিশুদের আরও উদ্বুদ্ধ করতেই এই আয়োজন– ড.পার্থ কর্মকার
- ক্লাসরুম-টিচিং গন্তব্যের পৌঁছাচ্ছে কতটা– মেচবাহার সেখ
- ক্লাসরুম : দেহ ও আত্মা– শ্রী সজল রায়চৌধুরী
- কল্পনা-জগৎ : শিশু ও তার আকাশ– শ্রীমতী সুদেষ্ণা মৈত্র
- ভাবনা-জগৎ : নিজ ভাবনায় শেখা– ডঃ অলকানন্দা ঘোষ সেনগুপ্ত
- বাঙালি শিশুর ইংরেজি শিক্ষা– শেখ আলি আহসান
- শিশুদের কৌতূহল বৃদ্ধি– সাবির আহমেদ
- শিশু-মনে কৌতূহল জাগিয়ে তোলা– ড.ওয়াসিকুল ইসলাম
- যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে দিতে হবে নৈতিকতার পাঠ– ড.অশোক কান্তি সান্যাল
- শৈশব : সফল জীবনের প্রাথমিক কর্মশালা– তাপস মুখোপাধ্যায়

সহযোগী সংস্থা

BES EDUCATIONAL HUB, P.O. & P.S.- Banshihari, Dist.- Dakshin Dinajpur, Haripur, 2016

BENGAL MODEL CHILD INSTITUTE, BMCI, BERACHAMPA

শ্রীরামপুর বেতারবাণী

CHECKMATE CAREER
DESIGNING FUTURE

শুভেচ্ছা

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত
প্রাক্তন চেয়ারম্যান,
পশ্চিমবঙ্গ শিশু শিক্ষা আয়োগ
এবং প্রাক্তন অধ্যাপক
বিধাননগর মহাবিদ্যালয়

আজকের শিশু আগামী দিনের সুনাগরিক। প্রকৃত সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে হলে শিশুদের অধিকার এবং তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানাতে হবে। ছোটবেলা থেকেই শিশুর জানা উচিত, তাদের মত প্রকাশের এবং জীবনধারণের অধিকার আছে, আবার সমাজের প্রতি তাদের কিছু দায়িত্বও আছে।

দায়িত্বের পাশাপাশি শিশুদের অধিকারের এই বার্তা ও অনুশীলন খুবই প্রয়োজন, অধিকার ও দায়িত্ব এরা-একে অপরের পরিপূরক। যখন কেউ অধিকারের কথা শোনে, ধীরে ধীরে তার মানসপটে অপরকে অধিকার দেওয়ার কথাও ভেসে ওঠে।

মনে রাখতে হবে, শিশুর যাবতীয় উৎসাহ, কৌতুহল, সৃজনশীলতার যথাযথ বিকাশ-ই সুন্দর সমাজ গঠনের উপাদান।

অনুসন্ধান সোসাইটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের নিয়ে আগামী ১৩ জুলাই ২০২৫ যে কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে তা সেই কাজকেই এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। 'শিশু মনে- ভাবনার সাথে শেখা' বিষয়টিও অতি চমৎকার। আশা করি, গুণীজনদের সমাগমে খুদে পড়ুয়ারা একদিকে যেমন উৎসাহিত হবে, অন্যদিকে শিক্ষা সমাজ আবার খুঁজে পাবে আগামী দিনের উজ্জ্বল পথের সন্ধান।

অনুসন্ধান সোসাইটি-র পক্ষে গৌরাঙ্গ সরখেল এবং নায়ীমুল হক সাহেবরা যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের সে উদ্যোগ সফল হোক এই কামনা করি।

সম্পাদকীয়

ভাষা শিখনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অপরিহার্য ভূমিকা

দিব্য গোপাল ঘটক
ডেপুটি ডাইরেক্টর
(অবসরপ্রাপ্ত),
শিক্ষা দপ্তর,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, " মালমশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর, তাহার আর সন্দেহ নাই। মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইট পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্ত্বে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটাই একটা মস্ত ভুল।" শিশুর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান বিকাশের ধারায় এই 'সংগ্রহ' ও 'নির্মাণ' এর মধ্যেকার লড়াইটি আজ বহাল আছে। সংগ্রহ করা যতটা সহজ, নির্মাণ করা ততটাই দুঃসাধ্য। সংগৃহীত ইনপুটএর পরিকল্পনাবিহীন ব্যবহারে কোনো নির্মাণই সার্থক হতে পরে না। নির্মাণে এক প্রকার ফলিত বিজ্ঞানের প্রয়োগ লাগে। এটাকে এক কথায় বলা যায়- learning engineering। আর শিশুর মধ্যে জটিল নির্মাণ কাজ এখান থেকেই শুরু।

প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করতে না পারলেও শিশু যত বয়সে বড়ো হতে থাকে, ততই তার মধ্যে একটা বহুমুখী ও প্রয়োগধর্মী ক্ষমতা বাড়তে থাকে। আর আমরা জানি ,এই সব অল্প শিক্ষিত কারিগর, শ্রমিক, শিল্পী, কৃষক আর অন্যান্য পেশাজীবিদের দক্ষতার উপর সারা পৃথিবী নির্ভর করে আছে। প্রথাগত বিদ্যালয়ের সরাসরি ইনপুট ছাড়াই যদি কেউ জীবন ধারনে মোটামুটি সক্ষম হয়ে উঠতে পারে তা হলে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে - এত বিদ্যালয়ের কি আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে?

বিদ্যালয়ের এই সব পাঠ্য, পাঠন প্রণালী ইত্যাদি আজকের দিনে কতটা বৈধ? শিশুর জীবন গঠনে কি একটি বিদ্যালয় সত্যিই কোনো সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারছে?

▶ এরপর ৫ম পৃষ্ঠায়

বিশেষ সাক্ষাৎকার

শিশু-মনের চাহিদা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা

[শিশু মনের চাহিদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর তা পূরণ করার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব অপরিসীম। শুধু লেখাপড়ার সংক্ষিপ্ত পরিসরে নয়, জীবনের বিস্তৃত ময়দানে। বলেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডঃ দীপক রঞ্জন মণ্ডল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা অধিকর্তা ও অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য]

- শিশুর স্কুল-জীবন শুরুর অনুভূতি কেমন হয়....
- শিশু যখন প্রথম স্কুলে যায় তাদের মনে থাকে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। দাদা-দিদি থাকলে স্কুল যাওয়া রোমাঞ্চকর হয়। আর উল্টো দিকে পরিবারের প্রথম সদস্য হিসেবে স্কুলে যেতে হলে প্রথম প্রথম থাকে চাপা উত্তেজনা, তারপর কিছুটা ভীতিও চেপে বসে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুই এক সপ্তাহ পুরনো হয়ে গেলে আপন করে নেয় শিশুরা, বন্ধুত্ব তৈরি হয়।

একটা সময় ছিল যখন বয়স ছয়ের কোটায় না পৌঁছলে স্কুলে যাওয়ার কথা ভাবাই হত না। খেলে বেড়ানোটাই ছিল আসল কাজ। এখন চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। পারলে জন্মের পর থেকেই স্কুলে পাঠিয়ে দেয়! তৃতীয় বছর পেরোতে না পেরোতেই খোঁজখবর, ইন্টারভিউ,......। যেন স্কুলে না গেলে পিছিয়ে পড়ছে, ঠিক করে কথা বলাটাও বাড়িতে শিখছে না দাদু দিদিমার কাছে গল্প শিখছে না বাড়ির পশুদের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি হচ্ছে না, প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনের পাঠ তো প্রায় উঠেই গেছে। তবে এসবই এখন কালের নিয়ম ভেবে মেনে নিতে হবে।

পরিষ্কার মনে আছে, আমার স্কুল জীবন শুরু হয় আর পাঁচ দশটা বাচ্চার মতোই। সত্যি কথা বলতে কী, মনেও নেই, তখন আমার বয়স পাঁচ কী ছয়! অজ পাড়া-গাঁর তস্য গ্রামের পাঠশালাতে যাবো তার আবার বয়স গুণে লাভ কী! স্কুল মানে – বগলে তালপাতার চটি আর ঝোলাতে সেলেট-পেন্সিল সম্বল করে দে দৌড়। সে সবের মজাই আলাদা ছিল। এখনকার ছাত্র ছাত্রীরা ওসব বুঝবে না। ওরা কেন, ওদের মা-বাবারাও সে সব দৃশ্য কল্পনায়ও আনতে পারবে না।

- এ তো গেল আগেকার কথা। এখন তো একটু বড় হয়ে গেলে ছেলে-মেয়েরা স্কুলেই যেতে চায় না। কী বলেন আপনি......
- মনে রাখতে হবে, শিশুমনে সুপ্ত যা কিছু থাকে, তার প্রকৃত বিকাশ ঘটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমণ্ডলে। এর কোনো বিকল্প হয় না। একটু উঁচু ক্লাসে উঠে যারা স্কুলে না গিয়ে অন্যভাবে নিজেকে 'উন্নীত' করার চেষ্টা করে, তাদের যথাযথ বিকাশ ঘটে? কোনোভাবেই না। ফলতঃ তাদের সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান পূর্ণতা পায় না, দায়িত্ববোধ তৈরি হয় না, এমনকি গড়ে ওঠে না তাদের বন্ধুসুলভ আচরণও। বন্ধু না থাকলে বন্ধুত্বই বা গড়ে উঠবে কীভাবে! স্কুল বলতে তো কেবলই নিস্প্রাণ ঘর-বাড়ি, চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড এগুলোই বোঝায় না। স্কুল হল পবিত্র স্থান, পূণ্য অর্জন করার জন্য পবিত্র স্থানে যেমন মানুষ যায়। তেমনই স্কুল হল ছাত্র-জীবনে মোক্ষ জ্ঞান লাভের পিঠস্থান। শিক্ষক শিক্ষিকা হলেন মেন্টর, জীবন পথের সরলরেখা এঁকে দেবেন যাঁরা।

বিবেকানন্দ বলেছেন "শিক্ষা শুধু জ্ঞান সঞ্চয় নয় শিক্ষা হল সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ" আর এই বিকাশের কারিগর হল শিক্ষক সমাজ। একটি

▶ এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

শিশু-শিক্ষা : মন ও ভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এক অংশ

ড: অমরেন্দ্র মহাপাত্র
সভাপতি,
পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র মুক্ত
বিদ্যালয় সংসদ

শিশুর মানসিক বিকাশে ভাবনার এবং শিক্ষার সঠিক সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি শিশুর চিন্তাভাবনার জগৎকে বিকশিত করতে এবং তাদেরকে সঠিক পথে চালিত করতে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সঠিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত পরিবেশের মাধ্যমে একটি শিশু তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। তাছাড়া শিক্ষা একটি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে, ফলে তাদের জীবনে একটি সুন্দর ও সবল ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভাবনার সাথে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদের যেমন সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়, ঠিক তেমনি উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে। শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ভাবনা এবং অনুভূতির বিষয়টি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মন হলো অসীম সম্ভাবনার ক্ষেত্র আর সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে ঐ সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করা যায়। শিক্ষা এবং শিশুর ভাবনা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা শুধু যে জ্ঞান অর্জন করে-তা কিন্তু নয়, বরং তাদের মধ্যে চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে, যা তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে, কল্পনাশক্তি বৃদ্ধিতে ও সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সহায়ক হয়। এছাড়া শিশুরা শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখে, যা তাদের আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্ববান ও মনের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে এবং একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করে।

শিশুর মনে ভাবনা এবং শিক্ষার মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। শিক্ষা শিশুর চিন্তাভাবনা ও কল্পনার বিকাশ ঘটায় আবার একই সাথে শিশুর ভাবনাগুলো শিক্ষার পথকে আরও সুগম করে তোলে। এখানে যদি একটু এইভাবে আলোকপাত করি যে, এক-শিশুর শিক্ষার পথে ভাবনা, দুই-শিশুর ভাবনা বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা, তিন-শিশুর মানসিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা, চার-শিশুর ভাবনা-চিন্তা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে অভিভাবকের ভূমিকা।

এক-শিশুর শিক্ষার পথে ভাবনা

● আগ্রহ সৃষ্টি করা : -

শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে হলে, তাদের ভাবনাগুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের কৌতূহল এবং আগ্রহের বিষয়গুলোকে শিক্ষার সাথে যুক্ত করলে, তারা আরোও ভালো করে সবকিছু শিখতে পারবে।

● শিশুর শেখার উপযোগী পদ্ধতি :-

প্রতিটি শিশুর শেখার ধরন ভিন্ন, তাই তাদের জন্য উপযোগী পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত। কেউ ছবি দেখে, কেউ গল্প শুনে আবার কেউ কেউ খেলাধূলার মাধ্যমে সহজে শিখতে পারে।

● সহায়ক পরিবেশ : -

একটি মুক্ত ও সহায়ক পরিবেশ শিশুদের ভাবনাগুলোকে আরও বিকশিত করতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন করার এবং তাদের নিজেদের মতামত দেওয়ার বা প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

● বাস্তব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব :-

বাস্তব অভিজ্ঞতা শিশুদের শেখার প্রক্রিয়াকে আরও অর্থবহ করে তোলে। তাদের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত করে এবং হাতে-কলমে শেখার সুযোগ দিয়ে শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

● শিক্ষকের ভূমিকা :-

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বন্ধু হিসাবে পাশে থেকে তাদের ভাবনাচিন্তাগুলোকে উৎসাহিত করতে পারেন। তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া, তাদের পথ দেখানো এবং তাদের শেখার আগ্রহকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া।

শিশুর ভাবনা বিকাশে শিক্ষা

● শিশুদের চিন্তাশক্তির উন্মোচন :-

শিক্ষা শিশুদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে। এটি তাদের চিন্তাভাবনার জগৎকে প্রসারিত করে এবং নতুন কিছু জানার আগ্রহ তৈরি করে।

● সৃজনশীলতা বৃদ্ধি :-

শিক্ষা শিশুদের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে। তারা নতুন ধারনা তৈরি করতে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে এবং নিজেদের ভাবনাগুলোকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে শেখে।

● সমস্যা সমাধান :-

শিক্ষা শিশুদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে শেখায়। তারা সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষন করে এবং যুক্তির মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পায়।

● সিদ্ধান্ত গ্রহন :-

শিক্ষা শিশুদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। তারা পরিস্থিতি বিশ্লেষন করে এবং তাদের উপলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শেখে।

● জ্ঞান অর্জন :-

শিক্ষা শিশুদের জ্ঞান অর্জন করতে সহায়তা করে। তারা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে ফলে তাদের জ্ঞানভান্ডার বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং শিক্ষা এবং শিশুর ভাবনা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর ভাবনাগুলো বিকশিত হয় এবং তাদের ভাবনাগুলো শিক্ষার পথকে আরও সুন্দর করে তোলে।

শিশুর মানসিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা

আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যে একটি শিশু তার জীবনের প্রথম ৮ বছরে যে মানসিক বিকাশ লাভ করে, তা তার সমগ্র জীবনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। সাধারনত: গবেষনায় দেখা গেছে যে, শিশুর মস্তিষ্কের ৯০ শতাংশ বিকাশ হয় ঠিক এই সময়েই। ঠিক এই সময়কালে শিশুরা যেখানে সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করে-তা হল বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয় তাদের মানসিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় শুধু জ্ঞানার্জনের স্থান নয়, একটি শিশুর আবেগ, দক্ষতা, ইচ্ছা, সংযম, সামাজিক সম্পর্কের গভীরতা, ব্যক্তিত্ব, মানসিক ও শারীরিক বিকাশ এবং সর্বাঙ্গীন বিকাশ গঠনের এক বিশাল ক্ষেত্র। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি যে, শিশুর মানসিক বিকাশে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিশুর মানসিক জগতের গভীরে ডুব দিয়ে-তা একটু জানার চেষ্টা করবো। কীভাবে বিদ্যালয় একটি শিশুর মনস্তাত্ত্বিক গঠনে সহায়তা করে। এই লেখার উদ্দেশ্য হলো অভিভাবক, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শিশুর মানসিক বিকাশে বিদ্যালয়ের অপরিহার্য প্রভাব ও গুরুত্ব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারনা দেওয়া।

শিশুর মানসিক বিকাশ কী -

শিশুর মানসিক বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি শিশু চিন্তা করতে শেখে, পারিপার্শ্বিক জগৎকে বুঝতে পারে, আবেগ নিয়ন্ত্রন করতে পারে, অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে এবং সমস্যা সমাধান করতে শেখে। এটা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নয়, বরং এর পরিধি আরোও ব্যাপক।

আবেগ নিয়ন্ত্রনের শিক্ষা :-

শিশুরা বিদ্যালয়ে সাফল্য, ব্যর্থতা, বন্ধুত্ব, মতবিরোধের মতো নানান ধরনের আবেগিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে মেলামেশা তাদের আবেগকে চিনতে, বুঝতে ও ধীরে ধীরে তা প্রশমিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে শেখায় -

নৈতিকতা ও মানসিকতার মূল্যবোধ গঠনের শিখন :-

বিদ্যালয় শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাই যে শেখায়-তা কিন্তু নয়, এখানে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শৃঙ্খলা, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের মতো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলো শিশুদের মধ্যে জাগ্রত করতে সাহায্য করে। একটি শিশুর চরিত্র গঠনে এই মূল্যবোধগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করা :-

লেখাপড়ায় ভালো ফল করা, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করা ও সাফল্য অর্জন করা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা ও প্রশংসা পাওয়া শিশুদের মনের মধ্যে এক অনুপম আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া, শিক্ষক- শিক্ষিকাদের থেকে প্রশংসা ও উৎসাহ তাদের নিজেদের দক্ষতা ও ক্ষমতা সম্পর্কে এক ইতিবাচক ধারনা তৈরি করতে সাহায্য করে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারনা ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা শুধু শিক্ষাদানের পাশাপাশি রোল মডেল হিসাবে শিশুদের আচরন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ গঠনে প্রভাব বিস্তার করেন। একজন ভালো শিক্ষক শিশুর মনোজগৎকে বুঝে তার প্রয়োজন অনুযায়ী মানসিক সহায়তা করেন, যা শিশুর সর্বাঙ্গীন ও সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষন পদ্ধতি এবং শিশুর মানসিক বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গতানুগতিক মুখস্থ নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে যখন হাতে-কলমে শিক্ষা,

▶ এরপর পরবর্তী পৃষ্ঠায়

▶ তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

শিশু-শিক্ষা : মন ও ভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এক অংশ

প্রোজেক্ট-ভিত্তিক কাজ, আলোচনা এবং খেলার মাধ্যমে শেখানো হয়, তখন শিশুরা পড়াশোনাকে বোঝা মনে করে না, এটিকে আনন্দের সাথে গ্রহন করে। এটা তাদের মানসিক চাপ কমায় এবং শেখার আগ্রহ বাড়ায়।

শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নে বিদ্যালয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারে, যেমন-

১) প্রতিটি শিশুর আলাদা আলাদা শেখার ধরনকে বুঝে সেই অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকে সহায়তা করা।

২) শিশুদের আবেগ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া এবং সেগুলোকে মনোযোগ দিয়ে শোনা।

নেতিবাচক আচরনে কঠোর না হয়ে বরং তাদের প্রত্যেককে ইতিবাদক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুপ্রাণিত করা।

৪) সহপাঠীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সম্মানজনক আচরন করতে শেখানো।

৫) নৈতিক শিক্ষাকে পাঠ্যসূচির বাইরে বাস্তব অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করা।

যাইহোক, শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিদ্যালয়ের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ভয়, চাপ বা ভীতির পরিবেশ থাকে, সেখানে শিশুদের মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে, যেখানে উৎসাহ, সমর্থন, সম্মান এবং নিরাপত্তা থাকে, সেখানে শিশুরা সহজেই নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে।

চার-শিশুর চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে অভিভাবকের ভূমিকা -

অভিভাবকগন শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং রোল মডেল, তাই তাদের আচরন, মূল্যবোধ, ব্যবহার, আবেগ নিয়ন্ত্রন এবং শেখানোর পদ্ধতি শিশুর মানসিক বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলে। তাই শিশুর মানসিক বিকাশে অভিভাবকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকা এইভাবে হওয়া উচিত যে-

- ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা- যেমন, একটি নিরাপদ, প্রেমময় এবং সমর্থনকারী পরিবেশ, যা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।
- আবেগকে বোঝা ও সমর্থন করা - শিশুদের আবেগকে বুঝতে এবং তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে সহায়তা করা, যাতে তারা তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে এবং সাহসিকতার দিক দিয়ে আত্মতুষ্টি পেতে পারে।

  যোগাযোগ স্থাপন করা বাবা-মায়ের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করতে শেখে।
- আত্ম-নিয়ন্ত্রন শেখানো - শিশুদের আত্ম-নিয়ন্ত্রন শেখা এবং অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার দক্ষতা বিকাশে খুবই সহায়তা করে। তাছাড়া সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনার মাধ্যমে সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করা।
- উৎসাহের মাধ্যমে আগ্রহ সৃষ্টি করা পড়াশোনা, খেলাধূলা এবং সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করার মাধ্যমে শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি করা। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দেওয়া - নতুন কিছু অন্বেষন করা, সমাজের নানান সামাজিক কাজে অংশগ্রহন করা, খেলাধূলায় ও সাংস্কৃতিক জগতে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দিলে শিশুরা একদিকে যেমন উৎসাহিত হয় এবং তাদের আগ্রহ বাড়ে। ঠিক তেমনি এটি মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।
- আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করা - বিভিন্ন কাজে শিশুদের উৎসাহিত করলে তাতে তাদের আত্মবিশ্বাস জন্মে এবং ইতিবাচক মনের দিগন্ত উন্মোচিত হয়।
- শিশুদের প্রতি যত্নশীল হওয়া - শিশুদের চাহিদা বোঝা এবং তাদের প্রতি সহানুভুতিশীল হওয়া, ফলে তাদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটে।
- শিশুদের সাথে খেলাধূলা করা - খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুরা আনন্দ পায়, তাই তাদের সাথে খেলাধূলা করলে তারা খুবই উৎসাহিত হয় এবং আনন্দ পায়, ফলে তাদের সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া - শিশু মনে প্রচুর কৌতূহল থাকে। তাই তাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য তাদের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া এবং তাদের জিজ্ঞাসু মনকে উৎসাহিত করা খুবই প্রয়োজনীয়। যাইহোক, শিশুদের মানসিক বিকাশে অভিভাবকদের সচেতনতা এবং ইতিবাচক ভূমিকা একটি সুস্থ, সুখী এবং আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম গঠনে সহায়ক হয়। এছাড়া পরিবারের বড়দের একটা প্রকট ভূমিকা থাকে শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে। তাই শিশুদের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনে পরিবারের অভিভাবকগন নিজের কাজগুলি করলে হয়তো সুফল পাওয়া যেতে পারে বলে আমার মনে হয়

১) পরিবারের ছোটোরা ভুল বা অন্যায় কিছু করলে, সরাসরি তাদেরকে অভুযুক্ত না করে ভুলের অপকারিতাগুলি তার সামনে তুলে ধরুন।

২) শিশুকে উৎসাহ দিন যেন তার ক্ষমতার সর্বোচ্চটা সে করতে পারে।

৩) শুধু একাডেমিক রেজাল্ট দিয়ে মানুষকে মূল্যায়ন না করে সার্বিকভাবে তার ভালো দিক মূল্যায়ন করুন। কারন কে কোন দিকে ভালো করবে, তা কেউ বলতে পারে না। শুধু ভালো শিক্ষার্থী হলে চলে না, ভালো মানুষ হতে হবে। মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪) স্কুল থেকে ফিরলে শিশুকে জিজ্ঞাসা করুন, সে তার স্কুলে আজ কী শিখেছে। নির্ভয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে শিশুটি যাতে সবকিছু শেয়ার করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

৫) সব শিশুরই অবশ্যই কিছু না কিছু শক্তিশালী দিক রয়েছে। তবে তা একই সঙ্গে প্রদর্শিত নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন সময়ের এবং আপনার যত্নের। আপনার উৎসাহ ও যত্ন তার আত্মবিশ্বাসের পারদকে উর্দ্ধমুখী করে তুলবে।

৬) উপহাস পেয়ে যারা বড় হয়, তারা বড় হয়ে ভীতু হয়। সমালোচনার মধ্যে দিয়ে বড় হলে সে অপরের নিন্দা করতে শেখে। আপনার সন্দেহের তীর তাকে প্রতারনা করতে পারদর্শী করে তোলে। বিরোধের পরিবেশ শিশুদের মধ্যে জিঘাংশার জন্ম দেয় এবং শত্রুতা শেখায়।

৭) উৎসাহ পেলে শিশুরা আত্মবিশ্বাসী হয়। শিশুর প্রশংসা তাকে অন্যের ভালো গুনগুলো ধারন করতে সহায়তা করে এবং সুখী পরিবেশ তার মধ্যে ভালবাসা ও সৌন্দর্যের মাহাত্ম তুলে ধরে।

৮) ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ শিক্ষা- একজন শিশু তার পরিবারের বড়দের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। তাই শিশুদের এই সময়টাতে সঠিক শিক্ষা প্রদান করা অভিভাবকদের কর্তব্য।

৯) আপনার শিশুকে ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দিন। এক্ষেত্রে ভালো বই উপহার দিতে পারেন। উপহার পেলে শিশু মনে খুবই উৎসাহিত বোধ করবে। একটি ভালো বই একটি শিশুর ভাবনাকে বদলে দিতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন একটি শিশুর মধ্যে এক অসাধারন উপলব্ধির সমাবেশ ঘটাতে পারে, যা তাকে নতুন দিগন্ত উন্মোচনে অনুপ্রাণিত করবে। তাই সুযোগ পেলে শিশুকে নিয়ে বাহিরে কোথাও ঘুরে আসুন।

১০) সর্বোপরি একটি শিশুকে অন্যকে সাহায্য করার জন্য অনুপ্রাণিত করুন। তাকে বিনয়ী হতে শেখান, তাকে ক্ষমা চাইতে শেখান। অন্যকে ক্ষমা করার যে মাহাত্ম্য তার সামনে তুলে ধরুন। একটি সহযোগিতামূলক কাজের ক্ষেত্র গড়ে তুলুন, যা শিশুকে নেতৃত্ব দিতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, নিজের দেশের কল্যাণে যাতে সে একজন আদর্শবান এবং ভালো নাগরিক হয়ে উঠতে পারে সেই শিক্ষা দিন।

যাইহোক, অভিভাবকদের সার্বিক সহযোগিতা ছোটোদের পোঁছে দিতে পারে তাদের কাঙ্খিত সর্বোচ্চ কল্যাণে। তাই শিশুদের প্রতি যত্নবান ও মনোযোগী হওয়া বড়দের নৈতিক কর্তব্য ও দায়িত্বও বটে। বলা বাহুল্য, শিশুর শিক্ষায় ভাবনা বা চিন্তা করার ক্ষমতা অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা তাদের চারপাশের জগৎকে জানতে, বুঝতে সাহায্য করে এবং শেখার আগ্রহ তৈরি করে। অভিভাবকগন, পরিবারের বড়রা এবং শিক্ষককূল যদি তাদের ওই অনুসন্ধিৎসাকে সহায়তা করেন এবং কৌতূহলকে উৎসাহিত করেন, তাছাড়া তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও মতামতকে সহজভাবে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করার সুযোগ পায়, তবেই তাদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা-ভাবনার বিকাশ, সমস্যা সমাধান এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়, ফলে তাদের সার্বিক মানসিক বিকাশ ঘটে। এতে শিশুটি নিজে এবং সমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়। সুতরাং শিশুদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ভাবনা, চিন্তা ও কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত জরুরী। শিক্ষা কেবল তথ্য সরবরাহ করে না, বরং শিশুদের চিন্তাভাবনার ও কল্পনাশক্তির দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করে। ফলে সঠিক শিক্ষাই তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে বদ্ধপরিকর।

সাক্ষাৎকার

শিশুদেরকে আরো উদ্বুদ্ধ করতেই এই আয়োজন

শিক্ষামূলক সব ধরনের কাজে তাঁর উপস্থিতি, সকলের ডাকে সাড়া দিয়ে পাশে থাকাতেই তাঁর আনন্দ। গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র। বিশিষ্ট গণিতের অধ্যাপক, শিক্ষা-সংগঠক, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারি এডুকেশন বোর্ডের ডেপুটি সেক্রেটারি। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে অনুসন্ধান সোসাইটির এই আয়োজনে তিনিই মুখ্য আহবায়ক। ড.পার্থ কর্মকার। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন শিক্ষক নায়ীমুল হক।

- 'শিশু মনে-ভাবনার সাথে শেখা' এই কর্মশালার থিম। ক্লাস থ্রি/ফোর-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কর্মশালার নাম এরকম রাখার পিছনে কি ভাবনা?
- এই কর্মশালার থিম রাখা হয়েছে, শিশু মনে-ভাবনার সাথে শেখা। এর কারণ হল-শিশুরা জন্ম থেকেই খুব কৌতূহলী হয়। কোনো নতুন জিনিস সম্পর্কে জানতে চাওয়াটাই হল কৌতূহল। শিশুর মনে যখন এরকম কিছু প্রশ্ন তৈরি হয় তখন সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব যদি সে ঠিক মতো করে পায়, শিশুরা তা খুব পছন্দ করে এবং তাদের শেখার প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি আনন্দদায়ক করে তোলে। আসলে ভাবনা-চিন্তার মধ্যে দিয়েই তো সৃজনশীলতা তৈরি হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার সমাধান যখন সে খুঁজে পায় তখন তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতিতে ধরে রাখে। তাই শেখানো হোক শুধু তথ্য দিয়ে নয়, ভাবনা দিয়েও। এজন্যই শিশু শিক্ষা নিয়ে এবারের এই কর্মশালার নাম ভাবনার সাথে শেখা।
- ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আপনি সবসময় বলেন— ভিত মজবুত করো। এ ধরনের কর্মশালা খুদে পড়ুয়াদের ভিত মজবুত করতে কিভাবে সাহায্য করবে?
- ভিত মজবুত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ছোট থেকেই জ্ঞানের ভিত মজবুত হলে, তার উপর সৃষ্ট ইমারত দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ এর সমস্ত পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা প্রণালী প্রস্তুত করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তককে সামনে রেখেই এই কর্মশালায় ছাত্র-ছাত্রীরা শিখবে, কী করে বানান মনে রাখতে হয়, শব্দভাণ্ডার বাড়লে সুন্দর বাক্য কী করে লেখা সম্ভব হয়, কোনো কিছু শুনে বা পড়ে কিংবা ছবি দেখে তার থেকে মূল বিষয়বস্তু কী করে তুলে আনতে হয়- এ সমস্ত শিখবে। এছাড়াও নিজের দেহ থেকে, প্রকৃতি থেকে বিজ্ঞান ও গণিতের কত কিছু শিক্ষনীয় আছে, তাও জানবে খুদে পড়ুয়ারা। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের মাস্টারমশাইরা এভাবেই পড়ান। তবে এই ধরনের কর্মশালা খেলার ছলে পাঠদান যে কতটা শিশুদের কাছে আনন্দদায়ক হয় তা আরও একবার দেখানো হবে। কিছু আধুনিক ও উন্নততর পদ্ধতিও উঠে আসবে এই কর্মশালায় বলে আমার বিশ্বাস।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে আগামী দিনে কি পরিকল্পনা?
- গুণী শিক্ষাবিদ, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবকরা খুব আগ্রহ ভরে এগিয়ে এসেছেন এই কাজটিকে সফল করার তাগিদ নিয়ে। এর সাথে অবশ্যই শামিল করে নেব ছাত্র-ছাত্রীদের। ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীরা খুব উৎসাহ দেখিয়েছে। বিধান নগর কলেজের অধ্যক্ষের কথা বলতেই হয়। শিশু শিক্ষার এই আয়োজনের কথা শুনে এক বাক্যে তাঁদের অডিটরিয়াম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। সব মিলিয়ে অনেকের স্বেচ্ছাশ্রমে এই সুন্দর কর্মসূচিটি সফল হলে আগামীদিনে বিভিন্নভাবে ভাবা যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের আরো এগিয়ে নেয়া যায় কিভাবে। এর ফলে আরো অনেকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ হবেন। এবং নিশ্চয়ই এতে আগামী প্রজন্ম খুবই উপকৃত হবে।

▶ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

ভাষা শিখনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অপরিহার্য ভূমিকা

যদি ধরে নিই যে ঠিকমতো চলছে না, তবে আসুন দেখি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এলে একটা শিশু কোন বিষয়গুলি সার্থকভাবে শিখতে পারবে।

১) ইংরেজি আর বাংলা ভাষায় কাঙ্খিত মানের একটি পাঠ্যাংশকে শিশু গড় গড় করে রিডিং পড়তে পারবে এবং তার অর্থ বুঝতে পারবে। মিনিটে অন্তত ১৩০ টি শব্দ সঠিক উচ্চারণ ও যতি চিহ্ন সহকারে সে পড়তে পারবে। দু তিনটি দুরূহ শব্দ থাকলে তার সম্ভাব্য অর্থ আন্দাজ করতে পারবে। পাঠ্যাংশের মূল মূল শব্দ, চরিত্র, ঘটনা চিহ্নিত করতে পারবে। কোনো অংশ বুঝতে না পারলে নিজে নিজে প্রশ্ন করে তার উত্তর খুঁজে বাক্যগুলির মর্মার্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। এগুলি শিশু নিজে নিজেই করে উঠতে পারবে। কারুর ক্ষেত্রে সময় কম, কারুর ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। শিশুর ভুলের প্রবনতা দেখে সে কোন মানের রিডার সেটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষকের কাজ হলো শিশুকে ধাপে ধাপে ইঙ্গিত, সংকেত আর option দিয়ে(পূর্ণাঙ্গ উত্তর বলে দিয়ে নয়) এই কাজটিকে সুচারুভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করানো।

২) এ ছাড়া শিক্ষক ঐ পাঠ্যাংশের মধ্যে থেকে শব্দ সূত্র নিয়ে দুরূহ বানানের রহস্যভেদ করতে সাহায্য করতে পারেন, মূল শব্দ নিয়ে মানস মানচিত্র রচনা করতে বলতে পারেন, কিছু নির্বাচিত শব্দের পদ পরিবর্তন করে বাক্যকে পুনর্গঠন করতে বলতে পারেন; ছোট ছোট বাক্যে ভাঙ্গা বা জুড়ে জুড়ে বড়ো বাক্য নির্মাণ করাতে পারেন; দুরূহ বড়ো বাক্য বারবার পড়ে 'কে', ' কাকে', 'কখন', 'কিভাবে', 'কেন' ইত্যাদি প্রশ্ন করে অর্থ উদ্ধারের কৌশল অভ্যাস করাতে পারেন; প্রান্ত -মুক্ত (open-ended) প্রশ্ন করে নিজের ভাবনা প্রকাশ করায় সাহায্য করতে পারেন। ওপরের কাজগুলি ব্যাকরণ হিসেবে না করিয়ে 'ভাষা নিয়ে মজার খেলা' হিসাবে করাতে হবে।

৩) সাধারণ পরিবারের শিশুরা শুদ্ধভাবে বাংলা ও ইংরেজিতে কথা বলতে এবং বোঝাতে পারে না। এই সামর্থ্য এ শিশুকে শক্তিশালী করে তুলতে প্রতিদিন 'গল্প বলা আর কথোপকথনের খেলা ' র ব্যবস্থা করা যায়।

৪) এটা বুঝতে হবে যে শিশুকে সরল থেকে জটিল গুণমানে পৌঁছানোর কাজে সাহায্য করতে পারে কিছু Graded TLM ; এগুলোকে আগে থেকে প্রস্তুত করে নেওয়া শিক্ষকের কাজ। এ ছাড়াও শ্রেণীকক্ষের পঠন পাঠনের সময় তাৎক্ষনিকভাবে কিছু সামগ্রী, কাজ তৈরি করে নিতে হতে পারে। শ্রেণীকক্ষে মান অনুসারে পঠন সম্ভার সংগ্রহ ও প্রয়োগ করা যায়।১০০ ভাগ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষককে এগোতে হবে এটাই জরুরি উদ্দেশ্য।

৫) শিশু বিদ্যালয়ে এসে ধীরে ধীরে সরল থেকে উন্নততর লিখনে অভ্যস্ত হবে। শুধু পাঠ্যবই থেকে প্রশ্ন ও উত্তর করা নয়, free writing এ অভ্যাস করাতে হবে। Mind mapping যেহেতু শিশুকে চিন্তা করতে আর Semantic Mapping এর মাধ্যমে প্রাপ্ত শব্দগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নানান দিক নিয়ে একাধিক সূত্র (link) আবিষ্কার করতে শেখায়; তাই এই কৌশলকে writing skill নির্মাণের শুরুতে সফলভাবে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।

উপরের সবটাই বিদ্যালয়ের কৃত্যালির মধ্যে পড়ে। কোনো অভিভাবক বা টিউশন শিক্ষকের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। শিশুর শিখন নিয়ে এগুলি নয়া দিকদর্শন।শিক্ষকদেরই শিখতে হবে এই কৌশল আর প্রয়োগ করতে হবে প্রাথমিকে প্রতিটা শ্রেণীর পঠন পাঠনে। শুরুর বিতর্কে আবার ফিরে গিয়ে বলি- পাঠ্যবই শিশুর সংগৃহীত একটি সামগ্রী মাত্র। একমাত্র নয়। পাঠ্যবই ছাড়াও আরও অনেক কৌশল ও সামগ্রী রয়েছে। যেমন শ্রেণীতে শ্রেণীতে মান অনুসারে লাইব্রেরি বই এর সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়। আর এই বহুমুখী কৌশলের প্রয়োগ ও ব্যবহার বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিশুর শিক্ষা যথেষ্ট সফল করে তুলতে সক্ষম হবে।আশা রাখি, তখনই সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের হৃত গৌরব ফিরে আসবে ধীরে ধীরে।

ক্লাসরুম টিচিং গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে কতটা?

মেচবাহার সেখ
লেখক ও প্রাক্তন
কনসালট্যান্ট, ইউনিসেফ
কলকাতা

ক্লাসরুম টিচিং, গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে কতটা - এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই মনের মধ্যে যে কথাটা ভেসে ওঠে সেটা হল - ক্লাসরুম টিচিং দেওয়াটা হচ্ছে শিক্ষকের কাজ, গন্তব্যটা নির্ধারণ করা থাকে পাঠক্রম এবং পাঠ্যসূচির মধ্যে। যেখানে শিক্ষকের সরাসরি কোন ভূমিকা থাকে না। তাহলে শিক্ষককে আগে দেখে নিতে হবে পাঠক্রম বা পাঠ্যসূচি অনুসারে তাকে কতটা পথ যেতে হবে। বা বলা যায় চলমান অবস্থায় তিনি কতটা গন্তব্যে পৌঁছেছেন এবং কতটা পথ তাকে পার হতে হবে। তাই শ্রেণি শিখনে (class teaching) শিক্ষককে প্রথমেই যেটা জানতে হয় বা হবে তা হল পাঠক্রমের বিষয়টা। শিক্ষকের কাছে এটা হল ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবার রাস্তা। ইংরেজিতে যাকে বলে শেখার জন্য রোড ম্যাপ বা শিক্ষার্থীর শেখার সামর্থ্য (learning competency) অর্জনের রোড ম্যাপ।

এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষককে প্রথমেই যেটা করতে হবে সেটা হল - একটি শিক্ষাবর্ষে কোনো একটি শ্রেণির কোনো একটি বিষয়কে (subject) শেখানোর জন্য যে সামর্থ্যগুলো শিক্ষার্থীদের অর্জন করিয়ে দিতে হবে সেই বিষয়গুলি বেছে বার করা এবং সেই মতো একটা ক্যালেন্ডার তৈরি করে নেওয়া। এখানে একদিকে যেমন সামর্থ্য অর্জনের বিষয়গুলোর একটা ছবি বা ক্যালেন্ডার তাঁর কাছে থাকবে, তেমনি সেই সামর্থ্যগুলো এক বছর ধরে কীভাবে তিনি কতগুলো শ্রেণি- ঘণ্টার (রুটিন) মধ্য দিয়ে শেখাবেন সেটাও তাকে আগে থেকেই ছকে নিতে হবে। অর্থাৎ শিখনের জন্য পরিমাপযোগ্য সামর্থ্য এবং সেই সামর্থ্য অর্জনের জন্য শ্রেণি -ঘন্টা নির্ধারণ - এই দুটোর মধ্যে সমন্বয় থাকা জরুরি । কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সামর্থ্যগুলি অর্জন করাতে যে শ্রেণি -ঘন্টা লাগবে তার সঙ্গে যদি কোন সমন্বয় না থাকে তাহলে শিক্ষার্থী গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না। এক্ষেত্রে দায় বর্তায় শিক্ষকের উপর বা শিক্ষা ব্যবস্থাপকদের উপর।

এখানে ছোট করে যদি বলি তাহলে বলা যায় যে, পাঠক্রম হলো বড়ো গন্তব্য আর পাঠক্রমের অভ্যন্তরে প্রতিটি পাঠে (lesson) যে সামর্থ্য গুলি থাকে সেগুলি হচ্ছে ছোট ছোট গন্তব্য। অর্থাৎ বড়ো গন্তব্যের অভ্যন্তরে ছোট ছোট গন্তব্য থাকে। অর্থাৎ যদি ১০০০ ফুট হাঁটতে হয় তাহলে সেটা হল বড়ো গন্তব্য আর প্রতি পদক্ষেপটা হচ্ছে তিন ফুট। এই তিন ফুট হল ছোট গন্তব্য। শ্রেণি শিখনে (class teaching) শিক্ষককে প্রতিনিয়ত দেখতে হবে যে একটি শ্রেণি ঘন্টায় সেই পাঠের অভ্যন্তরের সামর্থ্যগুলো তিনি সমস্ত শিক্ষার্থীদের অর্জন করিয়ে দিতে পেরেছেন কি না। কেননা ছোট গন্তব্যে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে শিক্ষাবর্ষের শেষে বড়ো গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। ছোট গন্তব্যগুলোকে এড়িয়ে বা ছোট সামর্থ্যগুলোকে অর্জন না করিয়ে কখনো বড়ো গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। শ্রেণি শিখনে (class teaching) এটা একটা পরিকল্পনার বিষয়, অংকের বিষয়, দায়বদ্ধতার বিষয়। শিক্ষক এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে কোন একটিতে যদি ব্যর্থ হন তবে তিনি শিক্ষার্থীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারবেন না বা বলা যায় শিক্ষার্থীরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে না।

ক্লাসরুম টিচিং এ গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে কতটা এটা শিক্ষককে প্রতিনিয়ত পরিমাপ করে দেখতে হবে। অর্থাৎ তিনি আজকে যেটা শেখালেন বা যে সামর্থ্য অর্জন করিয়ে দিলেন সেগুলো শিক্ষার্থীরা কতটা অর্জন করতে পারলো তাকে সেটা ফিরে দেখতে হবে। এই ফিরে দেখাটা হল প্রতিদিন কাজের শেষে মূল্যায়ন করা। প্রতিদিন প্রতি শ্রেণির টিচিং- এর পর মূল্যায়নের মধ্যে দিয়ে যদি দেখা যায় কিছু শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে তবে শিক্ষককে অতিরিক্ত সময় নিয়ে রেমিডিয়াল টিচিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। কোন শিক্ষার্থীকে পিছিয়ে রেখে কেবল অগ্রণীর শিক্ষার্থীদের যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তবে একাংশের শিক্ষার্থী গন্তব্যে পৌঁছাবে বাকিরা গন্তব্য থেকে অনেক দূরে থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের বিদ্যালয় শিক্ষায় প্রতিনিয়ত এটাই ঘটে থাকে যা বাঞ্ছনীয় নয়।

গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ক্লাস টিচিং এ যে বিষয়গুলো গুরুত্ব দেয়া জরুরি তা হল-

১. পাঠের অভ্যন্তরের সামর্থ্যগুলোকে চিহ্নিত করে রাখা সেই সামর্থ্যগুলো শিক্ষার্থীদের অর্জন করতে সাহায্য করা।

2. কোন পাঠটি কোন পদ্ধতিতে কোন উপকরণের সাহায্যে উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য অর্জনের সুবিধা হবে তার পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে আগেই করে রাখতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর হোমওয়ার্ক যেমন জরুরি তেমনি শিক্ষকেরও হোমওয়ার্ক জরুরি।

3. শ্রেণি শিখনে শিক্ষক মহাশয় উপস্থাপিত বিষয়ের উপর মাঝেমধ্যে ছোট ছোট প্রশ্ন উত্থাপন করে শিক্ষার্থীদের যাচাই করে দেখতে পারেন যে, তিনি যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন সেটা তাদের বোধগম্য হয়েছে কিনা বা তারা ধরে রাখতে পারছে কি না । সামর্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রে এটা একটা সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। যেটাকে বলা হয় তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন। শ্রেণি - শিখনে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের মনোনিবেশ করাতে বা তাদের মন ধরে রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

4. আর্থ- সামাজিক কারণে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা রাজনৈতিক অস্থিরতাজনিত কারণে যদি শিক্ষক শ্রেণী শিখনের পর্যাপ্ত বা যথোপযুক্ত সময় না পেয়ে থাকেন অর্থাৎ তার রোডম্যাপ অনুসারে শেখানোর সুযোগ না পান তাহলে শিক্ষককেই ঠিক করতে হবে তিনি শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম অনুসারে সামর্থ্য অর্জনের বিকল্প কী কৌশল গ্রহণ করবেন।

5. মূল লক্ষ্যে বা গন্তব্যে পৌঁছানোর আগে পার্বিক মূল্যায়ন সংগঠিত করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। পার্বিক মূল্যায়ন আমাদের বুঝতে সাহায্য করে গন্তব্যে পৌঁছাতে আমাদের কতটা পথ এখন বাকি আছে বা শিক্ষার্থীরা কে কোন স্তরে রয়েছে। একটি পার্বিক মূল্যায়ন অর্থাৎ চার মাস পর শিক্ষার্থীদের দোষ ত্রুটি যদি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের হাতে আট মাস সময় থাকে তাদেরকে সংশোধন করে কাম্য সামর্থের জায়গায় পৌঁছে দেবার। এই কারণে আমরা পার্বিক মূল্যায়নকে গঠনমূলক মূল্যায়ন (formative evaluation) বলি। ফর্মেটিভ ইভ্যালুয়েশনের মধ্যে দিয়ে চিহ্নিত ত্রুটি দুর্বলতাগুলো যদি সংশোধন করে না দেওয়া হয় তাহলে চূড়ান্ত মূল্যায়নে গিয়ে আমরা দেখব শিক্ষার্থীরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। ক্লাস টিচিংয়ে এই ফরমেটিভ ইভ্যালুয়েশন একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

6. শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জন করানো একদিকে যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব তেমনি শিক্ষার্থীর এবং তাদের অভিভাবকদের দায়িত্বও সমান। অর্থাৎ গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য কৌশল নিরূপণটা শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক সকল স্তরের পরিকল্পনার মধ্যে থাকা জরুরি। এক্ষেত্রে পরিকল্পনার ভাগাভাগিটা কেমন হবে সেটা নিজেদের স্তরে আলোচনার বিষয়। এ প্রসঙ্গে বলি - যদি কোন শিক্ষক বা শিক্ষকবৃন্দ অভিভাবক সভায় শিক্ষার্থীর সাফল্য ও দুর্বলতার দিকগুলি কোন অভিভাবককে বুঝিয়ে বলেন তাহলে সেই অভিভাবক বাড়ি ফিরে তার সন্তানের সাফল্যের জন্য হয়তো কিছু পরিকল্পনা করবেন, আবার শিক্ষার্থীকে যদি তার ত্রুটি দুর্বলতাগুলো ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেও নিজের মতো পরিকল্পনা করতে পারে। এটাই হলো পরিকল্পনার ভাগাভাগি। এদিক থেকে দেখলে গন্তব্যে পৌঁছানোটা সকল স্তরেরই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তবে সেটা কম আর বেশি।

তবে বেশি দায়িত্বের কথা যদি বলি তাহলে বলতে হয় পরিকল্পিতভাবে শিশুর শিক্ষা সুনিশ্চিতকরণের জন্য বিধিবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার অভ্যন্তরের কর্মীদের দায়িত্বই বেশি। আর সেটা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা তদারকি করার দায় বর্তায় সরকারের উপর। সে ক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন আসে সরকারের গন্তব্য কি, শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরকার কোথায় পৌঁছাতে চায়? আসুন ভাবা যাক।

▶ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

শিশু-মনের চাহিদা ও শিক্ষক-শিক্ষিকা

চারাগাছকে সুতোর টানে কখনোই বড় করা যায় না। আলো, বাতাস, জল ও মাটির মধ্যে গাছের খাদ্যে র প্রভাবের সমন্বয় গাছের স্বতঃস্ফূর্ত বৃদ্ধি ঘটায়। একটি শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশেও প্রধান শর্ত হল অনুকুল পরিবেশ, যা বহাল রাখার দায়িত্ব বেশিরভাগটাই বর্তায় শিক্ষকদের ওপর। অতঃপর ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলমুখী না হলে তা যে সরাসরি সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

- তাহলে আজকের ছাত্র-ছাত্রী সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?
- দেখুন, শহরে আমি থাকি আর কাজের তাগিদে বা কখনো এমনিই আমি রাজ্যম তথা দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর আমার পছন্দের জায়গাই হল গ্রাম, অজ গাঁ গঞ্জ। শুনেছি, দেখেছি ও মিশেছি স্কুল পড়ুয়াদের সাথে। স্কুলে যাওয়া নিয়ে মূলত শহুরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে অনীহা তার জন্য ওদের দায়ী করা ঠিক হবে না। এটা অনেকটা শহুরে সিস্টেম ও পরে স্টেটাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকরা এর জন্য মূল দায়ী। তবে ১০০ শতাংশ শহরের স্কুলে যে এরকম অবস্থা তা বলা যায় না। শহরের বহু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আজও স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর নির্ভর করে, ছোটোরা তো বটেই, বড়োরাও। ভুলে গেলে চলবে না শিশু ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু শিক্ষকের মূল্যা য়নও করে, শিক্ষকের অজান্তেই, তার প্রথম স্কুল যাত্রার দিন থেকেই। এদের যদি প্রশ্ন করা হয় সব চেয়ে ভালো শিক্ষক কে? সহজ উত্তর যা সচরাচর আসে তা হল, খেলাধুলার বা আঁকার শিক্ষক। আর যদি প্রশ্নটি এমন হয় যে সবচেয়ে কঠিন শিক্ষক? বেশির ভাগ উত্তর হয় - অংক স্যা র আর ইংরেজি স্যার।
- অংক, ইংরেজি কিছুটা বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে ছোটোদের এরকম মনোভাবের কারণ কী?এর নিরাময়-ই বা কিসে ?
- একটি বিষয় চোখে পড়ে, তা হল বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি অনাগ্রহতা। আর একটা দিক হল বিশেষ করে গ্রাম-গঞ্জের ছেলেমেয়েদের ইংরেজির প্রতি ভীতি। নিজের মনে কারণ খুঁজে বেড়িয়েছি। ইংরেজি বিষয়ে আলোচনা এখনকার মতো তোলা থাক। গণিত ও বিজ্ঞান নিয়ে না হয় দুচার কথা হোক।

আসলে, যে বিষয় যত কঠিন লাগবে সে বিষয় কত সহজে ছাত্রের সামনে তুলে ধরা যায় তা ভাবতে হবে।

প্রথমে বলি গণিত নিয়ে। গণিতের প্রতি অকারণ একটা ভয় অনেক সময় আমাদের পরিবার থেকেই চলে আসে। এটাও তো আর পাঁচটা বিষয়ের মতোই একটা বিষয়, এই মাইন্ড সেট দিতে হবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। আর হ্যাঁ প্রথমেই বোর্ড চক একদম নয়। বরং আমাদের দেহের মাথা, চোখ, আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করা যেতে পারে তারপর আসতে পারে গাছের পাতা পুকুরের মাছ আকাশের তারা ইত্যাদি। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের হাতে খড়ি বোর্ড চকের বদলে মারবেল গুটি বা দেশালাই কাঠি নিয়ে যদি মজা করে করা যায় তো কেমন হয়? ভেবে দেখতে পারেন। একটা বিষয় গণিত শিক্ষককে একটু পৃথক হতে হয় তাহলে ধৈর্য্য। এই বিষয়ে গণিত শিক্ষককে অনেক বেশি সচেতন হতে হয়। একবার যদি ভুল করে বলে দিয়েছেন "তোর দ্বারা কিস্সু হবে না বাপু"। তাহলেই গণিত ভুত আরো পেয়ে বসবে, একেবারে পোয়াবারো, গোটা ক্লাসে হাত পা ছড়িয়ে রাজত্ব শুরু করে দেবে। সুতরাং সজাগ হয়ে ভেবেচিন্তে ধৈর্য সহকারে গণিত শিক্ষককে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে যেতে হবে।

এবার আসি বিজ্ঞান বিষয়ে।

বিজ্ঞান যে কোনো বিশেষ জ্ঞান নয় এটি সবার আগে সকলের বোঝা দরকার। সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাই হল বিজ্ঞান। যা সহজ পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এই বোধটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের আশেপাশে বিজ্ঞান যে ভীষণভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এটি ছাত্রের সামনে তুলে ধরা দরকার। মাটি, জল, নদী, নালা, জীব, জীবানু যে আমাদের কত কাছের, যত বেশি আলোচনায় আসবে, জানবে ততই ছাত্র-ছাত্রীর আগ্রহ বাড়বে বিজ্ঞানের প্রতি। আমাদের দেশ যে অপরুপা বিজ্ঞানীগর্ভা তা ছবির মতো তুলে ধরতে হবে কচি-কাঁচা বিজ্ঞানীদের সামনে। বড় বৈজ্ঞানিকদের অবদানের সাথে সাথে তাঁদের জীবনের কথা, ছোটোবেলার কথা, লড়াইয়ের কথা, জীবনযুদ্ধের কথা, তাঁরা যে সকলে সোনার চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি এই সব কথা শিশুমনে আলাদা শিহরণ জাগাতে বাধ্য। কয়েকদিন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এই অনুশীলন করলেই হাতে নাতে এর ফল পাওয়া যাবে। আর একটা কথা, বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনায় খরচ বেশি এই ভুল ধারণা ছাত্রের মা-বাবাকে ত্যাওগ করতে হবে। অর্থ নয়, আগ্রহটাই মূল এই সত্যেটি সামনে আনার সামাজিক দায়িত্বটিও শিক্ষক শিক্ষিকাকে নিতে হবে।

সুখের কথা জাতীয় শিক্ষা নীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জীবনমুখি করার কথা বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। ছোটোখাটো পরিক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্য মে বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, যে সব পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা অপেক্ষা আরো আনন্দধর্মী পরিক্ষা-নিরীক্ষার উদ্ভাবক হতে পারেন আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাগন। শিক্ষক শিক্ষিকারা সমাজের দ্রোণাচার্য হাজারো অর্জুন অপেক্ষায় আছে তাঁদের জন্য।

শিশুর কৌতূহল বৃদ্ধি

সাবির আহমেদ
প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর,
প্রতীচী ইন্সটিটিউট

শিশু কেবল পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে না, বরং তার চারপাশ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারে। এজন্য একটি কৌতূহলী মন তৈরি করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রথমত, আমরা যখন কোনো শিশুর সঙ্গে পরিচিত হই, তখন তার নাম জানতে চাই। কিন্তু কখনো কি আমরা তাকে শিখিয়েছি, তার নামের অর্থ কী? এই নাম কে রেখেছিল? কেন রেখেছিল? এর পেছনের গল্প কী? এই কয়েকটি প্রশ্ন যদি আমরা ছোটবেলা থেকেই শেখাই, তাহলে তার মধ্যে একটি কৌতূহলী মন গড়ে উঠবে।

এই নামই তার প্রথম পরিচয়। নিজের নামকে ভালোবাসতে শেখালে সে জীবনে অনেক দূর এগোতে পারবে। নিজের নামকে ঘিরে তার মধ্যে গর্ববোধ তৈরি হবে।

অনেক সময় মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের নামের অর্থ জানতে চাইলে দেখা যায়, অনেকেই তা বলতে পারে না। অথচ এই প্রশ্নটি বহু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় করা হয়। প্রথম প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে অনেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, যদিও সে নিজের বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ।

এরপর ধাপে ধাপে তাকে জানতে হবে—কে তার প্রতিবেশী, তাদের ভাষা কী, তারা কী ধরনের পোশাক পরে। প্রতিটি বিষয়কে ঘিরে তার মধ্যে একটি ধারণা তৈরি করার মন গড়ে তুলতে হবে। এখান থেকেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পাঠ নিতে পারবে।

বাড়ির চারপাশে যে গাছপালা, পশুপাখি আছে—তাদের নাম, কোন ফল কখন ফলে—এই সাধারণ বিষয়গুলোর সঙ্গে যদি আমরা ধাপে ধাপে পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে সে বড় হয়ে একটি বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারবে।

যা সে পাঠ্যপুস্তকে পড়েনি, তা সে নিজের চোখে দেখে, প্রশ্ন করে, উত্তর খুঁজে নিয়ে একজন প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ হয়ে উঠবে।

সে কোথায় থাকে, কোন ব্লকে থাকে, কোন শহরে থাকে—এই শহরের ইতিহাস কী—এসব জানার আগ্রহ থাকলে সে নিজের শিকড়কে চিনতে পারবে। এই কৌতূহলী মন থাকলে সে জীবনের কঠিন পরীক্ষাগুলোতেও সহজে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

শিশু মনে – ভাবনার সাথে শেখা

ডঃ অলকানন্দা ঘোষ সেনগুপ্ত
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা,
কামরাবাদ গার্লস হাই স্কুল
(উচ্চ মাধ্যমিক, সোনারপুর,
দঃ চব্বিশ পরগনা)

জন্মগত ভাবেই প্রতিটি শিশু আলাদা, এবং তাদের মনের নিজস্ব চলন অনুযায়ী কিছু শেখার পদ্ধতিও অনন্য। শিশুর ভাবনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার শেখার অর্থ হল,সে তার চোখ দিয়ে যখন চারপাশের ঘটনা বা প্রকৃতিকে দেখে, তার কল্পনা, ঔৎসুক্য এবং সংগৃহীত জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই বিষয়ে একটা ধারণা তৈরি হয়। বড়রা যা বলবে, সেটাই মেনে না নিয়ে সে প্রশ্ন করে যেতে থাকে। এই অভিজ্ঞতায় যা সে অর্জন করে তাই তার শিক্ষা ! নিজেই যখন সে তার শিক্ষক, তখন অজানাকে জানার জন্য জ্ঞানের একটা তৃষ্ণা তৈরি হয় তার অজান্তে। এভাবেই পরিবার থেকে, পরিবেশ থেকে, চারপাশের অপার বিস্ময়কর জগৎ থেকে তার শিখন চলতেই থাকে।

প্রাথমিক স্তরে শিখন কখনোই শিক্ষকের দেওয়া বিশেষ কিছু তথ্যের একটা সংবহন প্রক্রিয়া নয়। জ্ঞানের জগতে শিশুর পা ফেলাটা একান্ত ব্যক্তিগত গভীর এবং আজীবনের যাত্রা। পরতে পরতে তার সামনে খুলতে জ্ঞানের দরজা, বোধ বা উপলব্ধি তৈরি হয়, তার সঙ্গে অভিজ্ঞতা আর কল্পনার মিশেলে সে বাবা মা শিক্ষকের চোখের সামনেই স্বশিক্ষিত হতে থাকে প্রতিনিয়ত, এবং বড় হওয়ার পথে পরিণত অনুসন্ধিৎসা তখন তার শিক্ষাকে অর্থবহ স্থায়ী রূপ দেয়, যা তার জীবনপথকে আলোকিত করে রাখে। তাই বাবা মা, পরিবার এবং সবার ওপরে শিক্ষকের ভূমিকা এই জন্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ধৈর্য্যের সাথে শিশুমনের সাদা ক্যানভাসে রঙ তুলির টান দিতে উৎসাহ দেওয়ার দায়িত্বটা তাদেরই। এর থেকে বেশি কিছু নয়, তাহলে তার কাছে তা বোঝার মত মনে হতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর খারাপ প্রভাবগুলোও আমরা জানি।

ছোটবেলায় খামখেয়ালীপনা, কল্পনা, রূপকথার গল্প শিশুকে যেমন স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের জগতের তফাতটাকে চিনতে শেখায় তেমনি সৃষ্টিশীলতা জাগিয়ে তোলে। স্বাভাবিক পরিবেশে শৈশব থেকে বেড়ে ওঠা কিশোর মন সৃজনশীল ভাবনার সাথে খেলতে থাকে, তাদের দৃষ্টিকোণটাই আলাদা, বড়রা আইন বা যুক্তির জালে আটকে যা দেখতে পাননা, মুক্ত চিন্তার আলোয় ছোটরা জটিলতা এড়িয়ে অনেক সমস্যার সহজ উত্তরও জুগিয়ে দেয়। এরাই হয়তো বড় হয়ে সাংস্কৃতিক, দার্শনিক বা কোন বিষয়ে বিমূর্ত ভাবনার অধিকারী হন। শিশু মনের নিজস্ব ভাবনায় শেখার সম্ভবত শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। শৈশব জীবন তাঁর মা অথবা পরিবারের বহু মানুষের প্রবল মনোযোগে কাটেনি, একা বালক জানালার ফাঁকফোকড় দিয়ে দেখা প্রকৃতির সাথে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করতেন কল্পনার রঙে আর চারপাশের মানুষজনের রোজকার জীবন লক্ষ্য করতেন। ছেলেবেলার সেই নিজেশেখা বাড়িতে পড়াতে আসা শিক্ষকদের কাছে তার পাঠগ্রহণের প্রক্রিয়াকে অবশ্যই মসৃণ করেছিল। শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ সারা জীবন ছিল তাঁর।

প্রকৃতিপাঠ হল শিশুর আর একটি অবশ্যপাঠ্য অধ্যায়। ঋতুর বিভিন্ন সময়ে গরমে হাঁসফাঁস, কনকনে শীত, গাছের পাতার খসে পড়া আবার অংকুরিত হওয়া, বর্ষায় মেঘ বিদ্যুতের খেলা, বৃষ্টির জল, বসন্তে প্রকৃতির সেজে ওঠা, শুঁয়োপোকার প্রজাপতি হয়ে ওঠা, চারা গাছের বড় হওয়া, কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটা, সাথে সাথে শিশুর নিজের বেড়ে ওঠা, মন ও শরীরের নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা – এইসব কিছুর যোগসূত্র আবিষ্কারে সে তখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। সেই আনন্দ অনুভূতি তার মননে এক গভীর ছাপ রেখে যায়, যা ক্লাসরুম শিখন, বইয়ের পাঠক্রমের পড়ার থেকে আলাদা।

শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক বা শিক্ষকদের সম্মান করা উচিৎ শিশুমনের "Alice in Wonderland" কে বা "হ য ব র ল" র গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়া ছেলেটিকে, তাদের সীমাহীন সৃজনশীল ভাবনার আর বোধের উন্মেষের প্রক্রিয়াকে। সত্যিকারের শিক্ষা যখন পঠন পাঠনকে সাধারণ তথ্য সঞ্চালনের বদলে শিশুর পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধিৎসা জাগানোর পদ্ধতি বলে মনে করে, কল্পনা করার এবং তা প্রকাশ করার স্বাধীনতা দেয়, প্রতি শিশুর একান্ত ব্যক্তিগত চারণভূমিতে নির্ভাবনায় শিখনের অনুমতি যখন শিক্ষক দেন ও ধৈর্য্য রাখেন, তখনই শিক্ষা আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক হয়ে ওঠে, সেই শিক্ষাই হয় স্থায়ী যার প্রভাব সারাজীবন থাকে।

শিশু ও তার আকাশ

সুদেষ্ণা মৈত্র
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা,
গোখলে
মেমোরিয়ালগার্লস স্কুল,
কলকাতা

শিশুর জগৎ এক আশ্চর্যের জগৎ। তার কল্পনা, তার ভাবনা, তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে কোনটিই বড়োদের সঙ্গে মেলে না।শিশুর একটা আকাশ আছে।সেই আকাশে সে ভাসতেভাসতে চলে। ডানা মেলে ওড়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে যে বা যারা উড়তে পারবেন তারা তত তাড়তাড়ি শিশুমনের কাছে পৌঁছতে পারবেন। প্রাথমিকস্তরে শিশুদের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, তাদের পড়ানো কোন এক ধাঁচে ফেলা যায় না। যিনি শেখাতে চেষ্টা করবেন তাকে ওদের সঙ্গে ডানা মেলে উড়তে হবে মনে মনে ওদের আকাশে।

শিশু মনের অনেক চাহিদা নিয়মের মধ্যে বন্দি থাকেনা। থাকেনা তাদের মন। তারা যেন সব সময়ই বলে, তাদের মনযেন কোথায় না কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে। চেষ্টা করলেও শিক্ষকদের সব সময় সিলেবাসের কথামাথায় রাখতে হয়। ফলেশিশু মনের সাথি হওয়া অনেক শিক্ষকএর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।শিক্ষার্থীদের বন্ধু হয়ে ওঠা সহজ নয়।আমার বত্রিশ বছরের পড়ানোর অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে করে ছোটোদের ভালোলাগা, মন্দ লাগাকে নিয়ে,তাদের শব্দ নিয়ে কাজ করে চলেছি।গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে বাংলা পড়িয়েছি সেই অভিজ্ঞতা এবংআমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইএর ড: এ.কে . জালালউদ্দীন এর কাছে শেখা ভাবনাই আজ তুলে ধরার চেষ্টা করছি। স্যার বলতেন যে শিশু যত শব্দের সঙ্গে পরিচিত হবে, তত সে মনে ভাব সহজে প্রকাশ করতে পারবে ।তাই আজ প্রাইমারি শিশুদের বাংলা ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা বলছি।

মনে রাখতেই হবে আমাদের (শিক্ষকদের) শিশুরা বাড়ি ছেড়ে, চেনা পরিবেশ ছেড়ে, মা, বাবাকে ছেড়ে আসে শ্রেণিকক্ষে। তাদের প্রথমেই প্রয়োজন ভালোবাসাদিয়ে শ্রেণিকক্ষটিকে দ্বিতীয় বাড়ি করে তোলা।নানা ছবি দিয়ে সাজিয়ে দিতে হবে শ্রেণিক্ষ। শুরুতেই নানা ছড়া শুনিয়ে ওদের শ্রবণ-শক্তিকে সজাগ করে তোলার চেষ্টা করতে হবে।তাই ছড়া শোনাতে শোনাতে ওদের চোখ-মুখের অভিব্যক্তিকে বুঝে নিতে হবে। নানা পশু,পাখির গল্প বলা, গাছ গাছের পাখির গল্প বলতে হবে। পারলে যেযে পশু ,পাখি, গাছ তারা তাদের চারিদিকে দেখে তার ছবি দেখিয়ে বা খেলনায় দেখিয়ে গল্প বলা যেতে পারে। এইভাবেই তারা অজান্তেই নিজেদের চারপাশের জীবজন্তুকে জানবে, চিনবে। তারা কিন্তু গল্প শুনতে শুনতে, টুকরো টুকরো অংশ বলতে চেষ্টা করবে। তাকে পূর্ণতা দেবেন শিক্ষক। খুব ধৈর্য ধরতে হবে, সহানুভূতিশীল মন নিয়ে ওদের পাশে থাকতে হবে।এক আকাশ প্রশ্ন খুঁজবে তারা নিজের দিদিমণি বা মাস্টার মশাইএর কাছে। এই সময়টি শিশুর ভিত তৈরি হয়। তাই খুব যত্ন ও সংযমী হয়ে শিক্ষকদের পাশে থাকতে হবে।

এরপর শিশুরা অক্ষর চিনবে, বলবে। তাই বর্ণের ঠিক উচ্চারণ শিক্ষকদের শেখাতে হবে।এখন এই স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য শিশুদের ছোটো ছোটো কবিতা ছড়া বারবার বলাতে হবে। এর মধ্য থেকে শিশুরা অনেক শব্দ জানবে।গান শোনাতে পারলে খুব ভালো হয়।এরপর ছোটো লেখা পড়তে শিখবে। হাতের লেখাতে হবে(দুটি শব্দ দিয়ে বাক্য/ তিনটি বা চারটি শব্দ দিয়ে বাক্য দিয়ে হাতের লেখা লিখতে দিলে। শব্দ, বাক্য সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি হয়ে যাবে।মাঝে মাঝ কোনো চেনা জিনিস দিয়ে ওদের বলতে বলা হবে। ওরা কিন্তু তখন কল্পনার ডানা মেলে কিছু কথা বলার প্রয়াসী হবে। অসম্ভব গল্প বলতে পারে, অবাস্তব হতে পারে দিদিমণি বা মাস্টার মশাইএর কাছে। তবুও মন দিয়ে শুনতে হবে। তারপর কোনো একদিন ক্লাসে রবীন্দ্রনাথের ‘দিনে হই একমত রাতে হই আর।/ রাতে-যে স্বপন দেখি মানে কীযে তার। ---- স্বপনে গেলাম উড়ে মেলে দিয়ে পাখা’এই ধরনের ছোটোদের কবিতা শোনাতে হবে।এর সঙ্গে চলবে ছোটোদের নানাধরনের শব্দ শোনা। ঝড়ের, জলের , কাঠকাটার, দমকল, অ্যাম্বুলেন্স এইভাবেশিশুর কল্পনাশক্তিকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ি দিতে হবে।

শিশুর চেতনার রঙে শ্রেণিকক্ষটি যেন আনন্দপূর্ণ হয়ে ওঠে, তবেই হবে এক আনন্দ। শিক্ষায় আনন্দ থাকতেই হবে।

বাঙালি শিশুর ইংরেজি শেখা

শেখ আলী আহসান
প্রধান শিক্ষক,
বারাসাত মহাত্মা গান্ধী
মেমোরিয়াল হাই স্কুল

আজকের অধিকাংশ বাঙালি বাবা-মায়ের প্রশ্ন- আমার শিশুসন্তানটিকে যদি সরকারি বাংলা মাধ্যমপ্রাইমারি স্কুলে পাঠাই তাহলে সে ইংরেজিটা ঠিকঠাক শিখবে তো? এই সংশয় আছে বলেই কিন্তু আজ চারদিকে ইংরেজি মাধ্যমস্কুলের এত রমরমা। কিন্তুঅভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি,একটু চেষ্টা করলেই বাংলা মাধ্যমস্কুলে পড়া শিশুটিও ইংরেজিতেসড়গড় হয়ে উঠতে পারে।

একটি শিশুকে বিজাতীয় একটি ভাষা শেখানো সহজকাজ নয়। তবুও বলব, অন্য অনেক বিদেশি ভাষা শেখার তুলনায় ইংরেজি শেখা অনেকটাই সহজ। দেখবেন, শিশু যখন লিখতে শেখে তখন সে বাংলা বর্ণের চেয়ে ইংরেজি বর্ণ লিখতেবেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং ইংরেজি বর্ণমালা সে কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি শিখে নেয়। এর কারণ, ইংরেজি বর্ণ লেখা অনেক সহজ এবং বর্ণের সংখ্যাও কম। তাই শিশু তাড়াতাড়ি সেগুলো আয়ত্ত করে ফেলতে পারে। কিন্তু তারপরেইমূল সমস্যাশুরু হয়। সে যখন একটি বাক্য গঠন করতে চায় বা ইংরেজিতে কথা বলতে চায় তখন সহজে সে সেটা পারে না। এটাই স্বাভাবিক।এই সময় সে যে সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। প্রথমেই আসবে ভাষাগত পার্থক্যের কথা। ইংরেজি বাক্যের গঠন বাংলার তুলনায় অনেকটাই আলাদা। সেই সঙ্গে উচ্চারণের পার্থক্য তো আছেই।দ্বিতীয় কারণ পরিবেশও সংস্কৃতিগত পার্থক্য। স্বাভাবিকভাবেইশিশু তার মাতৃভাষার মধ্যে যতক্ষণ কাটায় ইংরেজি নিয়ে নাড়াচাড়া করে তার চেয়ে অনেক কমসময়।তাছাড়া, বাড়িতে, এমনকি স্কুলেও হয়ত সেই পরিবেশ থাকে না। এর সঙ্গে আছে শিখনেরসমস্যা। নতুন একটা ভাষা- তা শোনা পড়া বলা লেখা, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা- সব ক্ষেত্রেই সে বাধার সম্মুখীনহতে থাকে।এর সঙ্গেই বলতে হয় আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতির সমস্যার কথা।যেকায়দায়স্কুলে বা বাড়িতে ইংরেজি শেখানো হয়, যে বইগুলোশিশুকে পড়ানো হয়, যে মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়- এর কোনোটাই নিশ্ছিদ্র নয়।নতুন একটি ভাষা শেখার সময় প্রতিটি শিশুর যে আলাদা আলাদা রকমের সমস্যা থাকতে পারে এবং প্রত্যেকের সমস্যা আলাদাভাবে দেখা দরকার- এটা কোথাও গুরুত্ব পায় বলে মনে হয় না। বাবা-মায়ের কথা ছেড়েইদিচ্ছি, যে শিক্ষকরা শেখাচ্ছেনতাঁদের কজনেরই বা সঠিক প্রশিক্ষণ বা প্রয়োজনীয় আন্তরিকতা আছে?আর একটা কথা বলতে হয়।আজকের এই উচ্চ প্রযুক্তির যুগে শিশুর ইংরেজি শেখার বহুরকম ডিজিটাল রিসোর্স তৈরি হয়েছে। সেখানে বাঙালি শিশুপ্রবেশাধিকার পায় না। এটাও তাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ।

সমস্যা তো অনেক। সমাধানকোথায়? যে কোনো সমস্যার সমাধান সমস্যার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। রাতারাতি সব কিছু পাল্টে ফেলা তো সম্ভব নয়। কিন্তু চেষ্টা থাকলে ধীরে হলেও সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

প্রথমেই লাগবে শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঠিকমতো ট্রেনিং- বিশেষত উচ্চারণ, শব্দ ওবাক্যগঠনের উপর।অতঃপর শিশুর ইংরেজি শিক্ষার বইপত্র ঠিকঠাক করতে হবে। বাজারে চলছে, তাই কিনে পড়ানো শুরু করে দিলাম- এমনটা করলে হবে না।শিখনের গোড়াতেই সে হোঁচট না খায়, ভয় পেয়ে থেমে না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে হবে। যেহেতু ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষ করা যায় তাই সেটা দিয়েই শুরু করতে হবে। প্রথমে সে ক্যাপিটাল লেটারে লেখা শিখবে, তারপর স্মল লেটার- প্রথমে গোটা গোটা হরফে, তারপর কার্সিভে। এরপরই আসবে উচ্চারণ। উচ্চারণের ক্ষেত্রে বানানের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেটা তাকে বোঝাতে হবে।এমন বই শিশুদের জন্য নির্বাচন করতে হবে যেখানে বিভিন্ন ভাওয়েল-এর সঙ্গে কনসোন্যান্ট যোগ করে কি কি উচ্চারণ হতে পারে তার বিস্তারিত তালিকা অবশ্যই থাকবে। এগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখাতে হবে, দায়সারাভাবে নয়। সঙ্গে সঙ্গে বানান ও উচ্চারণের তালমিল নেই এমন ব্যতিক্রমী উচ্চারণও ধরে ধরে শেখাতে হবে।এরপরদুই অক্ষরের শব্দাংশের সঙ্গে একটি করে বর্ণযোগে তিন অক্ষরের শব্দ, এবং তারপর সেই তিন অক্ষরের শব্দের সাথে আর একটি বর্ণ যোগ করে চার অক্ষরের শব্দ গঠন- এইভাবে এগোতে হবে। উদাহরণ:-at, bat, bath, bathe. এইভাবে খেলাচ্ছলে শিশুর শব্দভাণ্ডার উন্নত হয়ে উঠবে। গ্রামার শিক্ষারসময় কন্ট্রাস্টিভ মেথড, অর্থাৎ বাংলা ও ইংরেজির তুলনামূলক আলোচনা করতে করতেএগোনো যেতে পারে। যেমন পদ ও পার্টস অফ স্পিচ, পুরুষ ও পার্সন, বচন ও নাম্বার ইত্যাদি। তাহলে দুটোভাষাই একসাথে শেখা হয়ে যাবে, পড়ার একঘেয়েমিও কেটেযাবে। সেইসাথে দেখতে হবে যাতে ইংরেজিতে শিশুর এক্সপোজার যথাসম্ভব বেশি হয়। ছোট ছোট গল্প পড়ে শোনাতে হবে, যাতে ইংরেজি শোনারকান তৈরি হয়। এবার নিজে পড়ে তাকে বলতে হবে শব্দগুলো উচ্চারণ কর। এরকম দু'একবার পড়ার পর শিশুনিজে নিজে বানান করবে ও উচ্চারণ করবে। যাতে পড়া ও বলার জড়তা কাটানো যায়। ইংরেজি শেখার একটা পরিমণ্ডলগড়ে তুলতে হবে, যেমন স্কুলে তেমন বাড়িতে। শিশুরা খেলার মাধ্যমে শিখতে চায়, এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।বিভিন্ন ছবি চার্ট মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে।আজকাল শিশুদের ইংরেজি শেখার বহুরকম অ্যাপ চলে এসেছে, যেমন ডুওলিঙ্গো, ব্যাবেলইত্যাদি। বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে যেখানে শিশুদের ইংরেজি শেখানোর ব্যবস্থা আছে। যেমন বিবিসি লার্নিং, ইংলিশ সেন্ট্রাল,ই এস এল। ভার্চুয়াল ক্লাসরুম-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, যেখানে শেখানোও মূল্যায়ন দুটোই একসঙ্গে সম্ভব। বিভিন্ন গেমিফিকেশন প্লাটফর্ম রয়েছে যেখান থেকে শিশুরশিখনের উপযুক্তগেম ডিজাইন করে নেওয়া যায়।

মোট কথা, প্রত্যেক শিশুর ক্ষমতা ও চাহিদা অনুসারে লেসন ডিজাইন করে নিতে হবে। শিশু যাতে আনন্দের সাথে শেখে তা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই শিশু শিখবে। হ্যাঁ,বাংলা মাধ্যম স্কুলেই শিখবে।

ক্লাসরুম: দেহ ও আত্মা

সজল রায়চৌধুরী
অবসরপ্রাপ্ত
শিক্ষক ও লেখক,
সম্পাদক, মাতৃভাষা

রুম শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। এজন্য ক্লাসরুম শুনলেই একটা চার দেওয়াল দেওয়া ঘরের মানসছবি ভেসে ওঠে। কিন্তু ক্লাসরুম একটা ধারণা। যেখানে ক্লাস হয় সেটা রুমে হতে পারে। গাছের তলায়, মাঠে, তাঁবুতে, নৌকোয়ও হওয়া অসম্ভব নয়। সেটাই ব্যঞ্জনার্থে ক্লাস রুম । সুতরাং এর কোনো নির্দিষ্ট স্থাপত্যের কথা না ভাবাই ভালো।

এখানে কী ক্রিয়াকর্ম হয়? একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতি ও কথন লিখন সংলাপের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট (খুব নির্দিষ্ট না হলেও ক্ষতি নেই) বিষয়ের চর্চা হয়।

আমাদের চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী ক্লাসে একজন শিক্ষক থাকেন তিনিই মুখ্য ব্যক্তি। জ্ঞানের আধার। তিনি বক্তা । অন্যরা পড়ুয়া। তাদের কাজ শ্রবণ ও গলাধঃকরণ। শিক্ষক সক্রিয়। পড়ুয়ারা নিষ্ক্রিয়। এটা মৃত ক্লাস ।

ছোটো ছোটো পড়ুয়ারা অভ্যাসবশত বা আতঙ্কে নীরবে বক্তৃতা শোনে বা শোনার ভান করে।

প্রাণবন্ত ক্লাস সক্রিয়।

উৎফুল্ল অথচ সুশৃঙ্খল।

এ ধরনের ক্লাসের চালিকা শক্তি প্রশ্ন ও সংলাপ। শিক্ষক এখানে সর্বজ্ঞ প্রভু নন । পড়ুয়াদের মধ্যে জিজ্ঞাসা উসকে দেওয়ার বন্ধু। ক্লাসের আচরণগত বিধি থাকবে যে-কোনো প্রশ্ন করার অধিকার। শিক্ষক প্রথমেই কয়েকটি আশকথা পাশকথা মতো প্রশ্ন করবেন। আসলে এগুলোর মধ্যে দিয়ে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে যে বিষয়টি ক্লাসে আলোচনা হবে তাকে যুক্ত করবেন।

মূল চর্চাকেও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উত্তরটি পড়ুয়াদের মধ্যে থেকে বের করে আনার চেষ্টা করবেন। ক্লাসের ভালো ছেলেদের মধ্যে ই প্রশ্ন সীমাবদ্ধ রাখবেন না। চেষ্টা করবেন যত বেশি পড়ুয়াদের যুক্ত করা যায়। গোটা ক্লাস অংশগ্রাহী ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরিবেশ এমন রাখতে হবে যাতে ভুল উত্তর দিলেও হেয় না হতে হয় । এরই নাম সঞ্জীবনী ক্লাস রুম।

শিশু মনে—কৌতুহল জাগিয়ে তোলা

ড.ওয়াসিকুল ইসলাম
উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়
ও স্ল্যাক ল্যাবরেটরি,
স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়,
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

কৌতূহলই হল শেখা আর জ্ঞান অর্জনের প্রধান চালিকাশক্তি। যে শিক্ষার্থী সত্যিই কৌতূহলী, সে শুধু মুখস্থ করে না—সে জানতে চায়, বোঝার চেষ্টা করে যে কোন জিনিসের অন্তর্নিহিত কারণ। এই কৌতূহলই তাকে মনে রাখতে সাহায্য করে, নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করে, আর তার চিন্তাভাবনাতেও ইতিবাচক রং এনে দেয়। তাই আমাদের কর্তব্য হলো এমন একটি কার্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল বিকশিত হতে পারে। আর যারা প্রাথমিক স্কুলে বা ছোটদের পড়ান, তাদের দায়িত্ব আরও বেশি।

আমার ধারণা, পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত আবিষ্কার দাঁড়িয়ে আছে শুধুই কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসার উপর। আমরা প্রায়শই খবরের কাগজে পড়ি যে অনেক নামী বিজ্ঞানীর কৌতূহল তাদের শৈশব থেকেই গড়ে উঠেছিল। যেমন, ছোটবেলায় আলবার্ট আইনস্টাইন একটি চৌম্বকীয় কম্পাস পেয়ে অভিভূত হয়ে, ভাবতে লেগেছিলেন কীভাবে সূঁচটি একটি অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট দিকের দিকে ঘোরে, যা তার আজীবন কৌতূহলের জন্ম দেয়। ঠিক তেমনি থমাস এডিসন ছিলেন অতি কৌতূহলী শিশু—ছোটবেলা থেকেই করা অগণিত প্রশ্ন, আর অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরবর্তীকালে তাঁকে বৈদ্যুতিক বাতির উদ্ভাবক বানায়। এরকম অসংখ্য উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবী জুড়ে।

আরেকজন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত পদার্থবিজ্ঞানী, ইসিডোর আইজ্যাক রাবি, এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে তার মা তাকে ছোটবেলায় বিজ্ঞানী বানিয়েছিলেন, কারণ প্রতিদিন তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করতেন—"আজ তুমি কী নতুন প্রশ্ন করেছো?" বিজ্ঞানীদের কাজই তো তাই—নতুন প্রশ্ন করা এবং তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা। আমি নিজেও পার্টিকেল ফিজিক্সে গবেষণা করি এবং আমাদের গোটা গবেষণার ক্ষেত্র দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের উপর, যেমন—আমাদের মহাবিশ্ব কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এর গঠনমূলক একক কী কী ইত্যাদি। এ ধরনের বিভিন্ন গল্প, আলোচনা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করলে তারা বুঝতে পারবে যে কৌতূহলই হল মহান সব আবিষ্কারের মূল চাবিকাঠি। মনীষীদের এবং সফল মানুষদের জীবনী ও সাফল্যের গল্পও শিশুদের কৌতূহলী মনকে উৎসাহিত করতে পারে।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল বিকাশের অন্যতম কার্যকর উপায় হলো প্রশ্ন করার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। আমাদের উচিত শুধুমাত্র উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের আরও বেশি প্রশ্ন করতে অনুপ্রাণিত করা। তার জন্য দরকার শ্রেণিকক্ষে উন্মুক্ত আলোচনার পরিবেশ। যে কোনো প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়ে উত্তর দিলে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, এবং তারা আরও ভাবতে শেখে। কেউ যদি ভিন্নরকমের বা অত্যন্ত সরল এমনকি আপাত দৃষ্টিতে 'বোকা বোকা' কিম্বা আজগুবি প্রশ্নও করে, তবুও গুরুত্ব দিয়ে তার উত্তর দেওয়া উচিত। আমার একটি নিতান্ত ব্যক্তিগত ধারণা হল — অকৃত্রিম প্রশ্নকারী শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করা বা পুরস্কৃত করা উচিত, যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হতে পারে।

শিক্ষার্থীরা তখনই কৌতূহলী হয়, যখন তারা পড়াশোনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগাযোগ খুঁজে পায়। তাত্ত্বিক ধারণাগুলো অনেক সময় আবছা মনে হতে পারে, তাই পাঠ্যবিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে বাস্তব জীবনের উদাহরণ ব্যবহার করা দরকার। গল্প বলা, হাতে-কলমে demonstration দিয়ে শেখানো খুব উপযোগী। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, এক আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে, demonstration দেবার ব্যাপারে বিখ্যাত এক প্রফেসর এর সাথে আমি ভাগাভাগি করে একটা কোর্স পড়িয়েছিলাম কলেজ পড়ুয়াদের। আমি অভিভূত হয়ে দেখতাম, তিনি ক্লাসরুমে রোজ দৈনন্দিন জীবনের ব্যাবহারী বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে আসেন, অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন, যখন শিক্ষার্থীরা অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করে কেন এমন হল, তখন তিনি জটিল সব হিসাব কষে, ব্যাখ্যা করেন, পদার্থবিদ্যার concept বোঝান।

স্কুলের পরিবেশে এমন কিছু বস্তু সাজিয়ে রাখা যেতে পারে, যা দেখে শিক্ষার্থীদের মনে কৌতূহল জাগে। যেমন কয়েকটা উদাহরণ হতে পারে —একটি সাধারণ পেন্ডুলাম, একটি গ্লোব, কম্পাস, কয়েকটি চুম্বক বা কয়েকটা কাগজ আর পেনের মাধ্যমে তৈরি অটোমেটিক লিসাজিয়াস ফিগার ইত্যাদি। প্রকৃতিকেও নিয়মিত কাজে লাগানো যায় বিভিন্ন নিয়মিত আলোচনায় — যেমন ক্লাসরুমের জানালা দিয়ে উঁকি মারা সূর্যের আলো কীভাবে সুদূর সূর্য থেকে শ্রেণিকক্ষে পৌঁছাল, বৃষ্টির দিনে কিভাবে একটি জলের ফোঁটা, আকাশের কতটা সফর পার করে স্কুলের আঙ্গিনায় এসে পড়ল, রাতের আকাশের তারা কিভাবে জ্বলে, তা জেনেও কিছু ক্ষুদে শিক্ষার্থী কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে, প্রকৃতিকে আরও জানার জন্য!

প্রযুক্তি ও অনলাইন সম্পদ এখন অনেক নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে শিক্ষার পদ্ধতিতে বিপ্লব আনার জন্য, যদিও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহানুভূতিশীল, ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন বিকল্প নেই। ভালো শিক্ষকদের তৈরি করা সহানুভূতিশীল পরিবেশের জেরেই শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে আর ভয়, শঙ্কা ডিঙ্গিয়ে কৌতূহলী হয়।

শিক্ষক এবং স্কুল প্রশাসকরাই হলেন এই কৌতূহল বিকাশের মূল চালক। শিক্ষকেরা যদি নিজেরাই শেখার প্রতি আগ্রহী থাকেন, তবেই শিক্ষার্থীরাও তাদের অনুসরণ করবে। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীরা তাঁদের শিক্ষকদের প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইসঙ্গে শিক্ষার্থী-দরদী শিক্ষকদেরও যথাযথভাবে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার নিজের স্কুলজীবনে, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে, আমার এক প্রিয় শিক্ষক শ্রী অহীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি বাবুকে পেয়েছিলাম, যিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার যেকোন বিষয়ের প্রশ্ন শুনতেন, আর পরের দিন বই ঘেঁটে, আর পরিচিত বিভিন্ন শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করে সব উত্তর এনে আমাকে জানাতেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের বিভিন্ন সব স্কুলে স্কুলে এমন শিক্ষক অনেক আছেন, তাঁদেরকেও আমাদের সম্মানিত করা খুব জরুরী, তাতে অনেক নবীন শিক্ষকেরাও আরও সক্রিয় ভূমিকা নেবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হতে পারেন। তবে কৌতূহল নিয়ে আলোচনায়, এটাও উল্লেখযোগ্য যে কৌতূহলের পাশাপাশি আমাদের উচিত শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিকতা, সহনশীলতা, উত্তম চরিত্র ও সহমর্মিতার মতো গুণাবলির সঠিক বিকাশের দিকেও মনোযোগ দেওয়া, কারণ এই গুণগুলোর অভাব কৌতূহলের গভীরতা ও মূল্যকে সহজেই হ্রাস করতে পারে।

মোস্তাক হোসেন ট্যালেন্ট সার্চ-২০২৫

মেধার উন্মেষ ● দক্ষতা নির্ণয় ● সুস্থ প্রতিযোগিতা

ব্যবস্থাপনায় : বেস এডুকেশনাল হাব | সহযোগিতায় : জিডি স্টাডি সার্কেল, অনুসন্ধান সোসাইটি ও চেকমেট কেরিয়ার

পরীক্ষা কেন্দ্র ও সেন্টার ইনচার্জের দায়িত্ব

- প্রথম পর্বের পরীক্ষা : ২৪ আগস্ট ২০২৫
- চূড়ান্ত পর্বে পরীক্ষা : ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- পরীক্ষার মাধ্যম— বাংলা ও ইংরেজি
- পরীক্ষায় অংশ নেবে— যে কোনো বোর্ডের চলতি শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা
- সিলেবাস— প্রতিটি শ্রেণীর পরীক্ষা হবে বিগত বছর গুলির ও বর্তমান শ্রেণীর অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে। এছাড়াও উল্লেখিত সিলেবাসের বাইরে বোধমূলক ও উদ্ভাবনীমূলক প্রশ্ন থাকতে পারে
- পরীক্ষা হবে পাঁচটি বিষয়ে— ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রিজনিং
- মোট প্রশ্ন থাকবে— পাঁচটি বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের ৫০টি MCQ ধরনের, প্রতিটির মান এক
- পরীক্ষা ফি—৮০ টাকা, অনুশীলনী বই সহ ১৬০ টাকা
- সংগৃহীত অর্থের অর্ধেক নিজের কাছে রাখবেন এবং বাকি অর্ধেক কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হবে।
- ফর্ম পূরণ—কেবলমাত্র অফলাইনেই করা যাবে। ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ— ২০ আগস্ট ২০২৫

- রাজ্যের যেকোনো প্রান্তে সরকারি বা বেসরকারি স্কুল বা যেকোনো ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজস্ব সেন্টারে এই পরীক্ষার আয়োজন করতে পারেন। তবে অবশ্যই পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হবে।
- পরীক্ষার ফর্ম প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ফর্ম পাওয়া যাবে। পরীক্ষার্থী যে কেন্দ্রে ফর্ম পূরণ করবে, সেখানেই তাকে পরীক্ষায় বসতে হবে।
- পরীক্ষার্থীদের জন্য ইস্যু করা অ্যাডমিট কার্ডে যথাযথ ভাবে ফর্মের সিরিয়াল নম্বর এবং রোল নম্বর বসাতে হবে। রোল নম্বর নির্দিষ্ট নিয়মে হবে। যেমন; মডার্ন স্কুল, কলকাতা MS/KOL/01 এভাবে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে।
- পরীক্ষার আগেই বিক্রি হয়ে যাওয়া ফর্মের সমস্ত তথ্য, মোবাইল নাম্বার সহ ফরম্যাট কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।
- দূরবর্তী পরীক্ষাকেন্দ্রের জন্য প্রশ্নপত্র সহ অন্যান্য নিয়মাবলি ই-মেইলে আগের দিন পাঠানো হবে
- পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পরপরই কতজন পরীক্ষা দিয়েছে তার সংখ্যা জানাবেন
- পরীক্ষার পরের দিন প্রশ্নের উত্তর ই-মেইলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে।
- মূল্যায়নের পর পরীক্ষার ফলাফল ৩০ আগস্ট-এর মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে
- উত্তরপত্র মূল্যায়ন অনুযায়ী প্রতিটি শ্রেণির প্রথম তিনজন পরীক্ষার্থীর নাম, ফোন নম্বর ইত্যাদি জমা করতে হবে।
- তাদেরকে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে হবে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষার দিন (৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫) নির্দিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে।
- যে কোনো পরীক্ষা কেন্দ্রে সর্বনিম্ন ৭০-৮০ জন পরীক্ষার্থী হতে হবে, অন্যথায় পরবর্তী বছরে সেখানে সেন্টার করা সম্ভব হবে না।
- CENTRE IN-CHARGE / INVIGILATOR সকাল 10:30 মিনিটে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছাবেন।
- প্রতি কক্ষে জানালা, লাইট, ফ্যান ও জলের ব্যবস্থা আছে কি না দেখে নিবেন।
- ADMIT CARD দেখে প্রবেশ করাতে হবে
- কোনো পরীক্ষার্থী অসৎ উপায় অবলম্বন করলে সেন্টার ইনচার্জের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত
- পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং প্রশ্নের সংখ্যা মিলিয়ে নেবেন ও পরীক্ষার্থীর নাম, সেন্টার কোড দেখে SIGNATURE করবেন।
- কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে সেন্টারে প্রবেশ নিষেধ
- ATTENDANCE SHEET এর ROLL এবং ADMIT CARD এর ROLL NUMBER দুটোই যেন ঠিক থাকে।
- প্রশ্নে টিক চিহ্ন (√) দিয়ে উত্তর লিখতে হবে।
- প্রশ্নপত্রে ভুল থাকলে INVIGILATOR কিছু করতে পারবে না। পরীক্ষার পর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।
- CENTRE IN-CHARGE / INVIGILATOR প্রত্যেককে I-CARD ব্যবহার করতে হবে।
- সকাল 11.30 মিনিটে রিপোর্টিং এর শেষ টাইম
- সকাল 11.45 মিনিটে প্রত্যেক INVIGILATOR ATTENDANCE-এ নিজে SIGNATURE করে নিবেন
- প্রতিটি পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, নাম, ক্লাস যেন উল্লেখ থাকে।
- সকাল 11.55 মিনিটে প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে
- দুপুর 12 টায় উত্তর লেখা শুরু করবে
- দুপুর 12.40 মিনিটে WARNING BELL দিবে
- দুপুর 1 টায় শেষ ঘন্টা দিয়ে খাতা জমা নিবেন
- সর্বশেষে পরীক্ষার্থীদের সতর্কতার সহিত বাড়ি যাওয়ার পরামর্শ দেবেন

:: চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি ::

- কলকাতা -পার্ক সার্কাস (মডার্ন স্কুল)
- মুর্শিদাবাদ- বহরমপুর-ভাকুড়ি মোড় (বেস আন-নূর মডেল স্কুল)
- দক্ষিণ দিনাজপুর- হরিপুর (বেস আন-নূর মডেল স্কুল)
- দক্ষিণ দিনাজপুর- প্রাণসাগর (বেস আন-নূর মডেল স্কুল)
- দার্জিলিং-শিলিগুড়ি (মুরালিগঞ্জ হাই স্কুল)

- চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে "পুরস্কার, সার্টিফিকেট ও স্কলারশিপ প্রদান" অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গের জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হরিপুর বেস আন-নূর মডেল স্কুলে হবে। দক্ষিণবঙ্গের জন্য পৃথক তারিখ,স্থান ও সময় পরে জানানো হবে।

Helpline: 8617635400 // 9733187687 // 8130104184 besnoor2003@gmail.com

যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে দিতে হবে নৈতিকতার পাঠ

ড.অশোক কান্তি সান্যাল
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ বায়ো-ডাইভারসিটি

প্রাথমিক বিদ্যালয় পাঠের সময়টা জীবনের এমন এক পর্যায় যেখানে পরবর্তী পুরো জীবনের সাফল্যের ভিত রচনা হয়। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে নির্দিষ্ট পড়াশোনার সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে যুক্তিবোধ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরির বিষয়। শিশুদের এই দুটি বিশেষ বিষয়ে যদি বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষিত করা যায় তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে একজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিক তৈরি হবে। এই দায়িত্ব কিন্তু আসলেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। এখন প্রশ্ন হল শিক্ষকগণ কীভাবে এই শিক্ষা দেবেন? যুক্তিবোধ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত বিভিন্ন নীতিশিক্ষা মূলক গল্পের মাধ্যমে তার সারাংশ সহজ ভাষায় বোঝাতে হবে। নিজেদের চারপাশের নীতিবোধ সম্পর্কিত সত্য ঘটনা শোনাতে হবে। এই সমস্ত ঘটনার পরিনাম বিষয়ে উল্লেখ করে নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং অভিমত জানতে হবে। জীবনে চলার পথে সকল বিষয়ে সে ভালো বা মন্দ হোক তাকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করার পথ দেখাতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের চারপাশের মানুষের ও পরিবেশের সার্বিক তথ্য জানতে ও লিপিবদ্ধ করতে ও বিশ্লেষণ করতে শেখাতে হবে। এই ভাবেই যুক্তিবোধ জাগ্রত হবে। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান চেতনা বৃদ্ধি। এ বিষয়ে প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে হবে বিজ্ঞান কী? মানব জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা কী? তোমাদের মতো শিশুদের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কী? এই সম্পর্কগুলো খারাপ না ভালো, সেগুলো তাদের বুঝতে হবে। শিক্ষক মহাশয় তাদের সহজভাবে বোঝাবেন সংস্কার, কুসংস্কার এবং বিজ্ঞান কী এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক। এ দায়িত্ব শিক্ষকদেরই নিতে হবে।

শৈশব– সফল জীবনের প্রাথমিক কর্মশালা

তাপস মুখোপাধ্যায়
ইঞ্জিনিয়ার (বিদেশে কর্মরত)

মানুষের জীবনের সম্ভাবনা উন্মোচনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রথম পদক্ষেপ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। শৈশবে আমরা যে অভ্যাসগুলো শিখি তা আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক জীবনকেও প্রভাবিত করে। তাই, এক উজ্জ্বল আগামী দিনের জন্য আজকের শিশুকে শিক্ষা দেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটা শিশুর সুন্দরতর বিকাশের মাধ্যমে এক সুন্দরতম সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। বিস্ময়কর মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শিশুরা সবচেয়ে ভালো শেখে। সংশোধন নয়, কৌতূহল তরুণ মনকে শেখার জন্য অনুপ্রাণিত করে। খেলার মাধ্যমে শিশুরা দ্রুত শিক্ষা নেয়। প্রশংসনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শিশুর শেখা এক সম্ভবনাময় পথে চলতে শুরু করে। তরুণ মনে যখন শেখা এক নতুন আবিষ্কারের মতো মনে হয়, তখন তারা আরও গভীর স্তরে মন নিবেস করে। একান্নবর্তি পরিবারে, দাদু দিদা খেলার ছলে, গল্পের মাধ্যমে কিছু বিশেষ শিক্ষা দান করতেন। বর্তমানে ছোটো ছোটো সংসারে, কর্মব্যস্ততার কারণে, বাবা মা অনেক ক্ষেত্রেই শিশু মনে শিক্ষার বীজ বপন করতে অক্ষম।

কিছু সহজ কিন্তু প্রভাবশালী কৌশল গ্রহণ করে তরুণ মনের জন্য এক সুন্দর শেখার বাতাবরণ তৈরি করা যেতে পারে। খেলা ভিত্তিক শিক্ষা, নিয়মিত ভাবে বাড়িতে জোরে জোরে পড়ার পরিবেশ তৈরি করা, লেগো নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, খোলামেলা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, ফলাফল নয় প্রক্রিয়ার প্রশংসা করা - এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। কোনো একটা বিষয়ে শিশুকে তার মতামত রাখতে অনুপ্রাণিত করুন। দিনের একটা সময়ে, নিয়মিত ভাবে শিশুর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন, তাকে প্রশ্ন করুন, তার প্রশ্নের উত্তর দিন। তার নতুন কিছু শেখাকে প্রশংসা করুন।

তবে, সেরা কৌশল হল উদাহরণ দিয়ে অনুপ্রাণিত করা। আপনি যে জীবন দর্শন শেখাতে চান তা নিজে আচরণের মাধ্যমে শিশু চোখের সামনে এক উদাহরণ তৈরি করুন। প্রাথমিক পর্যায়ে, তরুণ মন আপনার মধ্যে এক উদাহরণ খুঁজে পায় যা তাদের বিশ্বাস জাগায়, স্বপ্ন দেখায় - শিশু মন আপনার মতই হয়ে উঠতে চায়। তাই আমাদের সকালের উচিত উন্নত মানের জীবন যাপন করে নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি তৈরী করা।

জীবনের দৈনন্দিন ব্যস্ত সময়সূচী থেকে, পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের উচিত তরুণ মনের সাথে উচ্চ মানের সময় কাটানো । ধীরে ধীরে সেই অভ্যাস শিশু মনকে বিভ্রান্তি থেকে স্পষ্টতার দিকে নিয়ে যাবে । আপনার পদক্ষেপ তাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করবে। তরুণদের নতুন কিছু শেখার গল্প বলতে উৎসাহিত করুন। প্রতিটি গল্পের মাধ্যমে তারা অজান্তেই নীতিবোধকে আরও উন্নত করবে। ঘর হল শিশুর প্রথম শ্রেণীকক্ষ। প্রতিটি কোণে শেখার সুযোগ তৈরি করুন। যখন আমরা একসাথে নতুন কিছু শিখি, তখন শেখা এক অভিনব মাত্রা পায়, মনের আনন্দে নতুন শিখি।

শৈশবের কৌতূহলের মধ্যে আজীবন শেখার বীজ লুকিয়ে থাকে। শিশু মনের প্রশ্নের যত্ন সহকারে উত্তর দিন। প্রতিটা প্রশ্নের মাধ্যমে, তারা তাদের শেখার সুযোগের জানালা খুলে দেয়। শিশুরা নতুন শেখাকে কোনও কাজ বলে মনে করে না । তারা আনন্দ অনুভব করে। সেই অনাবিল আনন্দের সাথে, প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার মধ্যে দিয়ে নিজের অজান্তে উজ্জ্বল আগামী দিনের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে তোলে। শেখা আনন্দের মধ্যে দিয়েই তারা তাদের আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যত তৈরি করে।

প্রতিনিয়ত নতুন মাত্রার লক্ষ নির্ধারণ করে নিজের প্রচেষ্টায় সেই লক্ষে পৌঁছানোর অভ্যাস তৈরি করা ছাত্র জীবনের এক বিশেষ শিক্ষা। পিতা, মাতা, শিক্ষক, পরিবারের সদস্যদের সেই অভ্যাস তৈরী করাতে শিশু মনকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

একদিন, তারা তাদের নিজস্ব নিবেদিতপ্রাণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে। সেই যাত্রা পথ আনন্দের। সেই পথে চলতে চলতে আমরা নিজেদের নতুন করে গড়ে তুলি। তারা উপর থেকে এক সুন্দর দৃশ্য অনুভব করবে, আমি আশা রাখি। শিশু মনের সেই বাগানে আসুন আমাদের অবদান রেখে যাই। সেই পথ আমাদের জীবনকেও মহিমান্বিত করবে।

শৈশবের কৌতূহলের মধ্যে আজীবন শেখার বীজ লুকিয়ে থাকে। শিশু মনের প্রশ্নের যত্ন সহকারে উত্তর দিন। প্রতিটা প্রশ্নের মাধ্যমে, তারা তাদের শেখার সুযোগের জানালা খুলে দেয়।

আমাদের নতুন উদ্যোগ | সারা রাজ্য জুড়ে

মোস্তাক হোসেন ট্যালেন্ট সার্চ-২০২৫

রাজ্যে শিক্ষা বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন শিল্পপতি ও সমাজসেবী মোস্তাক হোসেন। আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরেও সমাজে প্রচুর মেধাবী ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। আর্থিকভাবে পিছিয়েপড়া ছাত্রছাত্রীও আছে। এইসব ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ, দক্ষতার উন্নয়ন ও সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে বেস এডুকেশনাল হাবের ব্যবস্থাপনায় মোস্তাক হোসেনের নামে 'মোস্তাক হোসেন ট্যালেন্ট সার্চ' পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪ সালে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশ নিয়েছিল এই পরীক্ষায়। আশা করা হচ্ছে ২০২৫ সালে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসবে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

অংশগ্রহণ করবে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী

বিষয় ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রিজনিং

মাধ্যম বাংলা / ইংরেজি

প্রথম পর্বের পরীক্ষা	দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা
২৪ আগস্ট ২০২৫, রবিবার	৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রবিবার

নিকটবর্তী পরীক্ষাকেন্দ্র জানতে ১৫ জুলাইয়ের পর ফোন করুন

• র‍্যাঙ্ককারী ছাত্রছাত্রীদের প্রদান করা হবে •

স্কলারশিপ হিসেবে এককালীন নগদ অর্থ, পুরস্কার ও সার্টিফিকেট

তারিখ : ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, রবিবার

ব্যবস্থাপনায় **বেস এডুকেশনাল হাব**

উৎকর্ষ সহযোগিতায়

জি ডি স্টাডি সার্কেল ❖ অনুসন্ধান সোসাইটি

✆ ৮৬১৭৬৩৫৪০০ / ৯৭৩৩১৮৭৬৮৭ / ৮১৩০১০৪১৮৪

অনুসন্ধান সোসাইটির পক্ষে গৌরাঙ্গ সরখেল কর্তৃক ১২/১৮ শিমুলতলা লেন, হুগলি– ৭১২২৩২ থেকে প্রকাশিত
সম্পাদনা : দিব্য গোপাল ঘটক, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা : নায়ীমুল হক